যুল হজ্জের তের দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ .

رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾

আম্মা বা'দ, বাংলা ভাষায় হজ্জ ও উমরার বই-এর অভাব নেই। তবে তার কোনটি একেবারে সংক্ষিপ্ত। কোনটি বা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা থাকার ফলে আকারে দীর্ঘ। একাধিক বার হজ্জ-উমরাহ করার পর অধমের যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে এবং নানা দেশ ও মযহাবের হাজীদেরকে হজ্জ-উমরাহ করতে যে সব ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে তাই সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরার জন্য এই পুস্তিকার অবতারণা। ভ্রমণ-কাহিনী ও হারাম শরীফ তথা সঊদী আরবের সৌন্দর্যের কথা অনেকের জানা। যা জানা

নয় তা হল, এত বড় ব্যয়বহুল ইবাদতের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি। অতএব সঠিক নিয়ম-পদ্ধতির দিকটাই খেয়াল করে কেবল সেই দিকটাই প্রাধান্য দেওয়া হল এই পুস্তিকায়।

বহু ভুল-ভ্রান্তি ও সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে পরিশিষ্টে কিছু ফতোয়া সংকলিত হয়েছে। 'মাজালিসু আশরি যিল-হাজ্জাহ' ইত্যাদি যে সব বই সঊদী আরবের মসজিদে-মসজিদে যুল হজ্জ মাসের প্রথম পক্ষে আসরের পর বা এশার পূর্বে পাঠ করা হয় তারই অনুকরণে ঐ মাসের ৯ দিনে করণীয় বিষয়, কুরবানী ও ঈদ সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল সংযোজিত হয়েছে।

আশা করি হজ্জ ও কুরবানী করতে ইচ্ছুক মুসলিমের জন্য অত্র পুস্তিকা একটি পাথেয় এবং সুন্দর উপহার হবে। মহান আল্লাহর কাছে আমার আকুল আবেদন যে, তিনি যেন আমার এই নগণ্য খিদমতকে কবুল করে নেন এবং কাল কিয়ামতে এর অসীলায় আমার, আমার পিতা-মাতা ও ওস্তাযগণের মুখ উজ্জ্বল করেন। আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব সন ১৯৯৫ইং
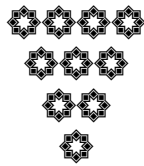
যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রত্যেক কাজ বা সৃষ্টি হিকমতে ভরপুর। প্রত্যেক বস্তুতে তাঁর প্রতিপালকত্বের দলীল এবং একত্বের সাক্ষ্য বিদ্যমান। তাঁর সকল কর্মেই পরিস্ফুটিত হয় তাঁর প্রত্যেক মহামহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত গুণ। কিছু সৃষ্টিকে কিছু মর্যাদা ও বিশেষ গুণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা, কিছু সময় ও স্থানকে অন্যান্যের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেওয়া তাঁর এই কর্মও তাঁর ঐ হিকমত ও মহত্বের অন্যতম।

আল্লাহ পাক কিছু মাস, দিন ও রাত্রিকে অপরাপর থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; যাতে তা মুসলিমের আমল বৃদ্ধিতে সহযোগী হয়। তাঁর আনুগত্যে ও ইবাদতে মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মঠ মনে নতুন কর্মোদ্যম পুনঃ পুনঃ জাগরিত হয়। অধিক সওয়াবের আশায় সেই কাজে মনের লোভ জেগে ওঠে এবং তার বড় অংশ হাসিলও করে থাকে। যাতে মৃত্যু আসার পূর্বে যথা সময়ে তার প্রস্তুতি এবং পুনরুত্থানের জন্য যথেষ্ট পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারে।

শরীয়তে নির্দিষ্ট ইবাদতের মৌসম এই জন্যই করা হয়েছে যাতে ঐ সময়ে ইবাদতে অধিক মনোযোগ ও প্রয়াস লাভ হয় এবং অন্যান্য সময়ে অসম্পূর্ণ অথবা স্বল্প ইবাদতের পরিপূর্ণতা ও আধিক্য অর্জন এবং তওবা করার সুযোগ লাভ হয়।

ঐ ধরনের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ মৌসমেরই নির্দিষ্ট এক একটা অযীফাহ ও কর্তব্য আছে; যার দ্বারায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সেই সময়ে আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণা আছে; যার দ্বারায় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করে থাকেন। অতএব সৌভাগ্যশালী সেই হবে, যে ঐ নির্দিষ্ট মাস বা কয়েক ঘন্টার মৌসমে নির্দিষ্ট অযীফাহ ও ইবাদতের মাধ্যমে নিজ মওলার সামীপ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর সম্ভবতঃ তাঁর অনুগ্রহের অধিকারী হয়ে পরকালে জাহান্নাম ও তাঁর ভীষণ অনলের কবল হতে নিস্কৃতি পাবে।

আমল ও ইবাদতের নির্দিষ্ট মৌসমসমূহে আল্লাহর অনুগত ও দ্বীনদার বান্দা লাভবান হয় এবং অবাধ্য ও অলস বান্দা ক্ষতির শিকার হয়। তাই তো মুসলিমের উচিত, আয়ুর মর্যাদা ও জীবনের মূল্য সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হওয়া এবং তৎসঙ্গে আল্লাহর ইবাদত অধিকরূপে করা ও মরণাবধি সৎকার্যে অবিচল প্রতিষ্ঠিত থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(( ))

অর্থাৎ, "তোমার ইয়াকীন উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা কর।" *(কুঃ ১৫/৯৯)*

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'ইয়াকীন' (সুনিশ্চয়তা) অর্থাৎ মৃত্যু। অনুরূপ বলেছেন মুজাহেদ, হাসান, কাতাদাহ প্রভৃতি মুফাস্সিরগণও। *(ইবনে কাসীর ৪/৩৭১)*

আল্লাহ আয্যা অজাল্ল যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনকে অন্যান্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন। "এই দশ দিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই।" (সাহাবাগণ) বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না। *(বুখারী, আবু দাঊদ)*

তিনি আরো বলেন, "আযহার দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পবিত্রতর ও প্রতিদানে অধিক বৃহত্তর আর কোন আমল আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট নেই।" বলা হল, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?!' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন ব্যক্তির (আমল) যে নিজের জানমাল সহ বহির্গত হয়, অতঃপর তার কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না।" *(দারেমী ১/৩৫৭)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ছিলাম। অতঃপর আমলসমূহের কথা উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, "এই দশ দিন ছাড়া কোন এমন দিন নেই যাতে আমল অধিক উত্তম হতে পারে।" তাঁরা বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ?' তিনি তার গুরুত্ব বর্ণনা করলেন, অতঃপর বললেন, "জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি যে নিজের জান-মাল সহ আল্লাহর রাস্তায় বের হয় এবং তাতেই তার জীবনাবসান ঘটে।" *(আহমদ, ইরওয়াউল গালীল ৩/৩৯৯)*

অতএব এই দলীলসমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে, সারা বছরের সমস্ত দিনের চেয়ে যুল হজ্জের ঐ দশ দিনই বিনা বিয়োজনে উত্তম। এমন কি রমযানের শেষ দশ দিনও ঐ দশ দিনের চেয়ে উত্তম নয়।

ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, 'মোট কথা বলা হয়েছে যে, এই দশদিন সারা বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন; যেমনটি হাদীসের উক্তিতে প্রতীয়মান হয়। অনেকে রমযানের শেষ দশ দিনের চেয়েও এই দিনগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, যে নামায, রোযা, সাদকাহ ইত্যাদি আমল এই দিনগুলিতে পালনীয় ঐ আমলসমূহই ঐ দিনগুলিতেও পালনীয়। কিন্তু (যুলহজ্জের) ঐ দিনগুলিতে ফরজ হজ্জ আদায় করার অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।'

আবার অনেকে বলেছেন (রমযানের) ঐ দিনগুলিই শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাতে রয়েছে শবেকদর, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

কিন্তু এই দুয়ের মধ্যবর্তী কিছু উলামা বলেন, (যিলহজ্জের) দিনগুলিই শ্রেষ্ঠ এবং রমযানের রাত্রিগুলি শ্রেষ্ঠ। অবশ্য এইভাবে সমস্ত দলীল সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর আল্লাহই বেশী জানেন। *(তফসীর ইবনে কাসীর ৫/৪১২)*

উক্ত দলীলসমূহ এই কথার প্রমাণ দেয় যে, প্রত্যেক নেক আমল (সৎকর্ম); যা এই দিনগুলিতে করা হয় তা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। অর্থাৎ, ঐ কাজই যদি অন্যান্য দিনে করা হয় তবে ততটা প্রিয় হয় না। আর যা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় তা তাঁর নিকট সর্বোত্তম। আবার এই দিনগুলিতে আমল ও ইবাদতকারী সেই মুজাহিদ থেকেও উত্তম, যে নিজের জান-মাল সহ জিহাদ করে বাড়ি ফিরে আসে।

অথচ বিদিত যে, আল্লাহর রাহে জিহাদ ঈমানের পর সর্বোৎকৃষ্ট আমল। যেহেতু আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন আমল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট?' তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান।" সে বলল, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ।" সে বলল, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "গৃহীত হজ্জ।" *(বুখারী ১৬নং)*

কিন্তু পুর্বোক্ত হাদীসসমূহ হতে প্রতিপাদিত হয়েছে যে, বৎসরের অন্যান্য দিনের সকল প্রকার আমল অপেক্ষা যুলহজ্জের ঐ দশদিনের আমল আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম ও প্রিয়তম। সুতরাং ঐ দশ দিনের আমল যদিও জিহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয় তবুও অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর; যদিও বা সেই আমল (অন্যান্য দিনে) শ্রেষ্ঠ। আর নবী ﷺ কোন আমলকে ব্যতিক্রান্ত করেননি। তবে এমন এক জিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন যা সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ; যাতে মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায় এবং আর ফিরে আসে না; যার ঐ আমল উক্ত দশ দিনের সমস্ত আমলের চেয়েও উত্তম।

কোন বস্তুকে যখন সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ বলা হয় তখন তার এই অর্থ নয় যে, ঐ বস্তু সর্বাবস্থায় ও সকলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ। বরং অশ্রেষ্ঠও তার নির্দেশিত বিধিবদ্ধ স্থানে সাধারণ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হতে পারে। যেমন, জিহাদ সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ আমল। কিন্তু অশ্রেষ্ঠ কোন নেক আমল তার নির্দেশিত নির্দিষ্ট ঐ দশ দিনে করা হলে তা জিহাদ থেকেও শ্রেষ্ঠ।

অনুরূপভাবে, যেমন রুকু ও সিজদার মধ্যে তসবীহ পাঠ কুরআন পাঠ হতেও উত্তম। অথচ কুরআন পাঠ সাধারণ সর্ববিধ তসবীহ ও যিক্র হতে উত্তম। *(ফতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৪/৩৬০, ফতহুল বারী ৬/৫)*

যুলহজ্জের এই দশ দিনের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রতিপন্ন হয়ঃ-

১- আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলির শপথ করেছেন। আর কোন জিনিসের নামে শপথ করা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ। আল্লাহ পাক বলেন, "শপথ ঊষার, শপথ দশ রজনীর----।" *(সূরা ফাজর ১-২ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ﷺ ইবনে যুবাইর ﷺ প্রভৃতি সলফগণ বলেন, 'নিশ্চয় ঐ দশ রাত্রি বলতে যুলহজ্জের দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে।' ইবনে কাসীর বলেন, 'এটাই সঠিক।' শওকানী বলেন, 'এই অভিমত অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণের।' *(তফসীর ইবনে কাসীর, ফতহুল কাদীর ৫/৪৩২)*

অবশ্য ঐ দশ রাত্রি বলতে এই দশ দিনকেই নির্দিষ্ট করে বুঝার ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিত আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট হতে আসেনি; যা সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। যার জন্যই এই ব্যাখ্যায় মতান্তর সৃষ্টি হয়েছে, আর আল্লাহই এ বিষয়ে অধিক জানেন।

২- নবী ﷺ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এই দিনগুলি দুনিয়ার সর্বোকৃৎষ্ট দিন। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৩- তিনি এই দিনগুলিতে সৎকর্ম করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেহেতু এই দিনগুলি সকলের জন্য পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ এবং হাজীদের জন্য পবিত্রস্থানে (মক্কায়) আরো গুরুত্বপূর্ণ।

৪- তিনি এই দিনগুলিতে অধিকাধিক তসবীহ, তহমীদ ও তকবীর পড়তে আদেশ করেছেন।

৫- এই দিনগুলির মধ্যে আরাফাহ ও কুরবানীর দিন রয়েছে।

৬- এগুলির মধ্যেই কুরবানী ও হজ্জ করার মত বড় আমল রয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, 'একথা স্পষ্ট হয় যে, যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ; যেহেতু ঐ দিনগুলিতে মৌলিক ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে যেমন, নামায, রোযা, সদ্‌কাহ এবং হজ্জ। যা অন্যান্য দিনগুলিতে এইভাবে জমা হয় না। *(ফতহুল বারী ২/৪৬০)*

কুরবানী করার ইচ্ছা থাকলে কি করবে?

সুন্নাহতে একথা প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা বা সংকল্প করেছে তার জন্য ওয়াজেব; যুলহজ্জ মাস প্রবেশের সাথে সাথে কুরাবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত সে যেন তার দেহের কোন লোম বা চুল, নখ ও চর্মাদি না কাটে। এ বিষয়ে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা যুলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করলে তখন সে যেন তার চুল ও নখ (কাটা) হতে কুরবানী না করা পর্যন্ত বিরত থাকে।" অন্য এক বর্ণনায় বলেন, "সে যেন তার (মরা বা ফাটা) চর্মাদির কিছুও স্পর্শ না করে।" *(মুসলিম)*

বলিষ্ঠ মতানুসারে এখানে এ নির্দেশ ওয়াজেবের অর্থে এবং নিষেধ হারামের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ, তা ব্যাপক আদেশ এবং অনির্দিষ্ট নিষেধ, যার কোন প্রত্যাহতকারীও নেই। *(তফসীর আযওয়াউল বায়ান ৫/৬৪০, আল-মুমতে ৭/৫২৯)* কিন্তু যদি কেউ জেনে-শুনে ইচ্ছা করেই চুল-নখ কাটে তবে তার জন্য জরুরী যে, সে যেন আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে এবং তার জন্য কোন কাফ্ফারা নেই। কেবল সাধারণভাবে কুরবানীই করবে। আবার প্রয়োজনে (যেমন নখ ফেটে বা ভেঙ্গে ঝুলতে থাকলে বা মাথায় জখমের উপর চুল থাকলে ক্ষতির আশঙ্কা হলে) কেটে ফেলতে কোন দোষ নেই। কারণ, সে মুহরিম (যে হজ্জ বা ওমরার জন্য এহরাম বেঁধেছে তার) অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার জন্য অসুবিধার ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডিত করাও বৈধ করা হয়েছে।

এই নির্দেশের পশ্চাতে যুক্তি এই যে, কুরবানীদাতা কিছু আমলে মুহরিমের মতই। যেমন, কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা ইত্যাদি। তাই কুরবানীদাতাকেও মুহরিমের পালনীয় কিঞ্চিৎ কর্তব্য পালন করতে দেওয়া হয়েছে।

এমন কোন ব্যক্তি যার চাঁদ দেখার পর কুরবানী করার ইচ্ছা ছিল না, সে চুল বা নখ কেটে থাকলে এবং তারপর কুরবানী করার ইচ্ছা হলে তারপর থেকেই আর কাটবে না।

কুরবানী করার জন্য যদি কেউ কাউকে ভার দেয় অথবা অসীয়ত করে তবে সেও নখ-চুল কাটবে না। অবশ্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা অসী এই নিষেধের শামিল হবে না। অর্থাৎ তাদের জন্য নখ-চুল কাটা দূষণীয় নয়।

অনুরূপভাবে পরিবারের অভিভাবক কুরবানী করলে এই নিষেধাজ্ঞা কেবল তার পক্ষে হবে। বাকী অন্যান্য স্ত্রী-পুত্র বা আত্মীয়দেরকে শামিল হবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কুরবানী

না থাকলে তারাও চুল-নখ কাটতে পারে। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ বংশধরের তরফ থেকে কুরবানী করতেন অথচ তিনি তাদেরকে নখচুল কাটতে নিষেধ করেছেন এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে পুনরায় হজ্জ করার নিয়ত করে (অর্থাৎ হজ্জও করে এবং পৃথকভাবে কুরবানীও করে) তবে এহরাম বাঁধার পূর্বে (যুলহজ্জের চাঁদ উঠে গেলে) চুল-নখাদি কাটা উচিত নয়। যেহেতু তা প্রয়োজনে সুন্নত।

অবশ্য তামাত্তু হজ্জকারী (হজ্জের ওয়াজেব কুরবানী ছাড়া পৃথক কুরবানী দেওয়ার নিয়ত থাকলেও) উমরাহ শেষ করে চুল ছোট করবে। কারণ তা উমরার এক ওয়াজেব। অনুরূপ কুরবানীর দিনে পাথর মারার পর কুরবানী করার আগে মাথা নেড়া করতে পারে।

প্রকাশ যে, 'যারা কুরবানী করে না তারা কুরবানীর দিনে নখ-চুল ইত্যাদি কাটলে কুরবানী করার সওয়াব লাভ হয়' এমন কথা এক হাদীসে থাকলেও তা সহীহ নয়। *(মিশকাত ১৪৭৯নং, যয়ীফ আবূ দাউদ ৫৯৫, যয়ীফ নাসাঈ ২৯৪, যয়ীফুল জামে' ১২৬৫নং)*

এই দশ দিনের অযীফাহ

এই দশ দিনকে সামনে পাওয়া বান্দার জন্য আল্লাহর তরফ হতে এক মহা অনুগ্রহ। মুত্তাকী ও নেক বান্দাগণই এই দিনগুলির যথার্থ কদর করে থাকেন। প্রতি মুসলিমের উচিত, এই সম্পদের কদর করা, এই সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিয়ে না দেওয়া এবং যত্নের সহিত বিভিন্ন ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে এই দিনগুলিকে অতিবাহিত করা।

এই দিনগুলিতে পালনীয় বড় বড় নেক আমল রয়েছে। মুসলিম সেই আমলসমূহের সাহায্যে বড় পুণ্যের অধিকারী হতে পারে। যেমনঃ-

১- রোযা পালন ঃ

যুল্ হজ্জের প্রথম নয়দিনে রোযা পালন করা মুসলিমের জন্য উত্তম। কারণ, নবী করীম ﷺ এই দিনগুলিতে নেক আমল করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর রোযা উত্তম আমলসমূহের অন্যতম; যা আল্লাহ পাক নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। যেমন হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেন, "আদম সন্তানের প্রত্যেক কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।" *(বুখারী ১৮০৫, মুসলিম ১১৫১নং)*

প্রিয় নবী ﷺ ও এই নয় দিনে রোযা পালন করতেন। তাঁর পত্নী (হযরত হাফসাহ রাঃ) বলেন, "নবী ﷺ যুল হজ্জের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন; মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।" *(সহীহ আবূ দাউদ ২১২৯নং, নাসাঈ)*

বাইহাকী 'ফাযায়েলুল আওকাত' এ বলেন, এই হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ঐ হাদীস অপেক্ষা উত্তম যাতে তিনি বলেন, 'রসূল ﷺ কে (যুলহজ্জের) দশ দিনে কখনো রোযা রাখতে দেখিনি।' *(মুসলিম ১১৭৬নং)* কারণ, এ হাদীসটি ঘটনসূচক এবং তা হযরত আয়েশার ঐ অঘটনসূচক হাদীস হতে উত্তম। আর মুহাদ্দেসীনদের একটি নীতি এই যে, যখন ঘটনসূচক ও অঘটনসূচক দু'টি হাদীস পরস্পর-বিরোধী হয় তখন সমন্বয় সাধনের অন্যান্য উপায় না থাকলে ঘটনসূচক হাদীসটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ কেউ যদি কিছু ঘটতে না দেখে তবে তার অর্থ এই নয় যে, তা ঘটেই নি। তাই যে ঘটতে দেখেছে তার কথাটিকে ঘটার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

মোট কথা, যুলহজ্জ মাসের এই নয় দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। ইমাম নওবী বলেন, 'ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা পাকা মুস্তাহাব।' *(শরহুন নওবী ৮/৩২০)*

তদনুরূপ আরাফার দিন রোযা রাখার নির্দিষ্ট ফযীলত আছে, যা পরে আলোচিত হবে। ইন শাআল্লাহ।

২- তকবীর পাঠ ঃ-

এই দিনগুলিতে তকবীর, তহমীদ, তহলীল ও তসবীহ পাঠ করা সুন্নত এবং তা উচ্চস্বরে মসজিদে, ঘরে, পথে ও বাজারে এবং সেই সকল স্থানে যেখানে আল্লাহর যিক্র বৈধ - পাঠ করা মুস্তাহাব। এই তকবীর পুরুষরা উচ্চস্বরে বলবে এবং মহিলারা চুপেচুপে। যার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত প্রচারিত হবে এবং ঘোষিত হবে তাঁর অনুপম তা'যীম। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, "যাতে ওরা কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট জানা দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে- পশু হতে তিনি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছেন তার উপর --।" *(সূরা হজ্জ ২৮ আয়াত)*

অধিকাংশ ব্যাখ্যাতার মতে 'নির্দিষ্ট জানা দিন' অর্থাৎ যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'নির্দিষ্ট জানা দিন' হল (যুলহজ্জের) দশ দিন এবং 'নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন' হল তাশরীকের কয়েকটি দিন।" *(বুখারী ২/৪৫৭)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন,

'নির্দিষ্ট জানা দিন' অর্থাৎ তাশরীকের পূর্বের দিনগুলি; তারবিয়ার দিন এবং আরাফার দিন। আর 'নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন' অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলি।

আর এই মতই ইবনে কাসীর আবূ মূসা আশআরী, মুজাহিদ, কাতাদা, আতা, সাঈদ বিন জুবাইর, হাসান, যাহহাক, আতা খুরাসানী, ইবরাহীম নখয়ী হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, 'এই মত ইমাম শাফেয়ীর। আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হতে এটাই প্রসিদ্ধ।' *(তফসীর ইবনে কাসীর, আযওয়াউল বায়ান ৫/৪৯৭)*

সুতরাং এই কথার ভিত্তিতে আয়াত শরীফে উল্লেখিত আল্লাহর যিক্র (স্মরণ) করার অর্থ হবে, আল্লাহ পাক যে গবাদি পশু মানুষের রুযীরূপে দান করেছেন তার উপর তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া আদায় করা) এবং এতে তকবীর ও কুরবানী যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া শামিল হবে। তাই আল্লাহর যিক্র বলতে কেবল যবেহকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করাই নয়। কারণ হজ্জে কুরবানী যবেহ করার দিন ঈদের দিন হতেই শুরু হয়। *(ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৪/২২৫)*

এই দিনগুলিতে পঠনীয় তকবীর নিম্নরূপঃ-

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ।

এ ছাড়া অন্যান্যরূপেও তকবীর পাঠ করার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের জানা মতে রসূল ﷺ হতে কোন নির্দিষ্টরূপ তকবীর সহীহভাবে বর্ণিত হয়নি। যা কিছু এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে সবই সাহাবাগণের আমল। *(ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫)*

ইমাম সানআনী বলেন, 'তকবীরের বহু ধরন ও রূপ আছে, বহু ইমামগণও কিছু কিছুকে উত্তম মনে করেছেন। যা হতে বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে প্রশস্ততা আছে। আর আয়াতের সাধারণ বর্ণনা এটাই সমর্থন করে।' *(সুবুলুস সালাম ২/১২৫)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তকবীর এ যুগে প্রত্যাখ্যাত সুন্নতের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম দশ দিনে তো অল্প কিছু মানুষ ব্যতীত আর কারো নিকট হতে তকবীর শুনাই যায় না। তাই উচ্চস্বরে তকবীর পড়া উচিত; যাতে সুন্নাহ জীবিত হয় এবং উদাসীনদের মনে সতর্কতা আসে।

পক্ষান্তরে এ কথা প্রমাণিত যে, ইবনে উমার ﷺ এবং আবূ হুরাইরা ﷺ এই দশ দিন বাজারে বের হতেন এবং (উচ্চস্বরে তকবীর পড়তেন। আর লোকেরাও তাঁদের তকবীরের সাথে তকবীর পাঠ করত। *(বুখারী)* অর্থাৎ, তাঁদের তকবীর পড়া শুনে লোকেরা তকবীর

পড়তে হয় একথা স্মরণ করত এবং প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক তকবীর পাঠ করত। তাঁরা একত্রিতভাবে একই সুরে সমস্বরে তকবীর পড়তেন না।

এই দিনগুলিতে সাধারণ তকবীর ও তসবীহ আদি যে কোন সময়ে দিনে বা রাতে অনির্দিষ্টভাবে ঈদের নামায পর্যন্ত পাঠ করতে হয়। আর নির্দিষ্ট তকবীর যা ফরয নামাযের জামাআতের পর (একাকী) পাঠ করা হয় আর তা অহাজীদের জন্য আরাফার (৯ম যুলহজ্জ) দিনের ফজর থেকে এবং মক্কা শরীফে হাজীদের জন্য কুরবানীর দিনের যোহর থেকে শুরু হয় এবং তাশরীকের শেষ দিনের (১৩ই যুল হজ্জের) আসর পর্যন্ত চলতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, বিলীন বা বিলীয়মান কোন সুন্নাহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় আল্লাহর নিকট মহা প্রতিদান ও বৃহত্তর সওয়াব রয়েছে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের মধ্যে কোন সুন্নত জীবিত করে যা আমার পরবর্তীকালে মৃত হয়ে পড়েছিল, তার জন্য সেই ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব হবে, যে তার উপর আমল করে এবং তাদের কারো সওয়াব কিছুও কম করা হবে না।" *(তিরমিযী)*

৩- হজ্জ ও উমরাহ আদায় করা ঃ-

এই দশ দিনের মধ্যে হজ্জ আদায় করা সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্যতম। অতএব যাকে আল্লাহপাক তাঁর গৃহের হজ্জ করার তওফীক দান করেছেন এবং যে যথার্থরূপে হজ্জ পালন করতে প্রয়াসী হয়, সে ইনশাআল্লাহ রসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বাণীতে তার মহাভাগ থাকবে, "মঞ্জুরকৃত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নয়।" যার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৪- কুরবানী করাঃ-

এই দশ দিনের করণীয় আল্লাহর নৈকট্যদানকারী আমলের মধ্যে কুরবানী করা অন্যতম। যার বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

৫- অন্যান্য নেক ও সৎকার্যে অধিক মনোযোগ দেওয়া ঃ-

এই দিনগুলিতে নেক আমল আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয়। আর তা হলে অবশ্যই এই দিনসমূহের কৃত আমলের মান ও মর্যাদা তাঁর নিকট অধিক। তাই মুসলিমের উচিত, যদি হজ্জ করা তার সামর্থ্য ও সাধ্যে না কুলায় তবে এই মূল্যবান সময়গুলিকে যেন সৎকার্য, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য; নফল নামায, তেলাওয়াত, যিকর, দুআ, দান, পিতামাতার অধিক খিদমত, আত্মীয়তা, সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দান, ইত্যাদি দ্বারা আবাদ করে। অন্ততঃপক্ষে ঐ দিনগুলিতে আল্লাহর রসূল ﷺ এর এই কথা স্মরণ করা উচিত, "যে

ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে (তাসবীহ, তাহলীল, তেলাওয়াত, ইল্ম বা দ্বীনী আলোচনায়) বসে এবং তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে তবে এক হজ্জ ও ওমরার সমপরিমাণ তার সওয়াব লাভ হবে।" *(তিরমিযী)*

আল্লাহর তরফ হতে বান্দার জন্য এটা এক সুবৃহৎ অনুগ্রহ এবং অতিশয় কল্যাণ। যার অনুগ্রহ ও করুণার শেষ নেই, যা চিন্তা ও ধারণায় কল্পনা করা যায় না। যাতে অনুমিতিরও কোন স্থান নেই। যেহেতু তিনি পুরস্কর্তা ও অনুগ্রাহী। তাঁর ইচ্ছামত তিনি যা দিয়ে, যাকে ইচ্ছা, যে কোন আমলের মাধ্যমে ইচ্ছা পুরস্কৃত ও অনুগৃহীত করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ রদ্দ করার কেউ নেই এবং কেউ তাঁর মঙ্গল ও অনুগ্রহকে রহিত করতে পারে না।

৬- বিশুদ্ধ তওবা করাঃ-

এই দশ দিনে মুসলিমদের জরুরী কর্তব্যের মধ্যে আল্লাহর নিকট তওবা করা, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা, কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পাপ ও অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াও উল্লেখ্য। তওবা হল- আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা; যে গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য জিনিস আল্লাহ ঘৃণা করেন সেই জিনিস হতে, যা তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন তার প্রতি, বিগত (পাপের) উপর লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করে, বর্তমানে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরপি তার প্রতি না ফেরার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে - ফিরে আসার নাম।

মুসলিমের জন্য ওয়াজেব; যখন সে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে অথবা অকস্মাৎ কোন পাপ করে বসে তখন শীঘ্রতার সহিত তওবার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা এবং এ কাজে গয়ংগচ্ছ অথবা ঢিলেমি না করা। কারণ, প্রথমতঃ সে জানে না যে, তাকে কোন ঘড়িতে মরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ; এক পাপ অপর পাপকে আকর্ষণ করে। তাই সত্বর তওবা না করলে হয়তো বা পাপের বোঝা নিয়েই মরতে হয় অথবা পাপের বোঝা আরো ভারি হতে থাকে।

গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ সময়কালে তওবার বড় গুণ থাকে। যেহেতু ঐ সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন আনুগত্য-প্রবণ থাকে এবং সৎকাজের প্রতি হৃদয় আকৃষ্যমাণ হয়। তখন হৃদয় অন্যায় ও পাপকে স্বীকার করতে চায় এবং কৃত পাপের উপর বড় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়।

যদিও তওবা করা এক প্রতিনিয়ত ওয়াজেব। তবুও যেহেতু তওবা করা আমল কবুল হওয়ার এবং আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করার হেতুসমূহের অন্যতম তথা পাপ দূরীকরণ ও মোচন হওয়ার কারণ। আবার ইবাদত আল্লাহর সান্নিধ্য ও ভালোবাসা লাভের হেতু। সেহেতু মুসলিম যখন বিশুদ্ধ তওবার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মর্যাদাপূর্ণ আমল করে থাকে তখন তার উভয়বিদ অতিরিক্ত কল্যাণ লাভ হয়; যা সফলতার প্রতি ঈঙ্গিত করবে

ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾

“তবে যে ব্যক্তি তওবাহ করে ও সৎকাজ করে সে তো অচিরে সফল কাম হবে।” *(কুঃ ২৮/৬৭)*

মুসলিম তওবা করবে পুরুষের মত। স্বামী সংসর্গ ত্যাগ করার উপর প্রসব বেদনাদগ্ধা নারীর মত তওবা করবে না। বরং তওবা করে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পক্ষান্তরে পাপ যদি সংসর্গ ও পরিবেশ-দোষে হয়, তাহলে সেই সংসর্গ ও পরিবেশ ত্যাগ করে সুন্দর নির্মল ইসলামী পরিবেশ গ্রহণ করবে এবং সৎলোকদের সংসর্গ গ্রহণ করে সৎকার্যে অবিচল থাকবে।

মুসলিমের উচিত, কল্যাণময় এই জাতীয় মৌসমের প্রতি লুব্ধ হওয়া। কারণ, তা ক্ষণস্থায়ী। আত্মার জন্য সংকট মুহূর্তে সাহায্যের জন্য নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। যেহেতু পৃথিবীতে অবস্থান কাল অতি অল্প। কুচের সময় আসন্ন, পথ শঙ্কাপূর্ণ, যেথায় প্রবঞ্চনার আশঙ্কাই অধিক এবং বিপদের ভয় বড়। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক সূক্ষ্ম ও সর্বদ্রষ্টা এবং তাঁরই নিকট সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল। আর “যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তা দর্শন করবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎকাজ করবে সে তাও দর্শন করবে।” *(সূরা যিলযাল ৭-৮আয়াত)*

হজ্জ সামর্থ্যবান মুসলিম (পুরুষ বা নারী) এর উপর আল্লাহর তরফ হতে এক ফরযকৃত আমল। তিনি বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

অর্থাৎ, “মানুষের মধ্যে যার (মক্কায় যাবার) সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ (কা’বা) গৃহের হজ্জ করা তার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য (ফরয)। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে,) নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী।” (তিনি জগতের উপর নির্ভরশীল ননা।) *(কুঃ ৩/৯৭)*

কুরআনের এই আয়াতের বাচনভঙ্গি আরবী ভাষায় অত্যাবশ্যকতার (ফরয বা ওয়াজেব হওয়ার) উপর বড় তাকীদ বহন করে; যে গুরুত্বপূর্ণ তাকীদ দ্বারা হজ্জকে ফরয করা হয়েছে

এবং তার মর্যাদাকে সুউন্নত করা হয়েছে। অতঃপর তৎসংলগ্নে 'কুফ্‌র' শব্দ যুক্ত হয়ে ফরযকে অধিক শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ করেছে। আর এই ফরযকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারকারীর উপর তিরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। *(ফতহুল কাদীর ১/৩৬৩)*

আল্লাহর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "ইসলাম পাঁচটি (স্তম্ভের) উপর প্রতিষ্ঠিত; আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর দূত (রসূল) এই সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর (মক্কা মুকার্রামায় অবস্থিত কা'বা শরীফের) হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা পালন করা।" *(বুখারী ৮নং,মুসলিম)*

হজ্জ জীবনে একবার ফরয। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "হজ্জ একবার, যে ব্যক্তি অধিকবার করবে তা (তার জন্য) নফল হবে।" *(আবূদাঊদ ১৭২১নং)*

অবশ্য উমরাহ ফরয কিনা তা নিয়ে উলামাদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। তবে তা ত্যাগ করা উচিত নয়। জীবনে অন্ততঃ একবার তা পালন করা কর্তব্য।

হজ্জ করার পূর্বেও উমরাহ করা যায়। ইবনে উমার ﷺ বলেন, "এতে কোন ক্ষতি নেই। নবী ﷺ হজ্জের পূর্বে উমরাহ করেছেন। *(বুখারী ৩/৫৯৮)*

রসূল ﷺ এই দুই ইবাদত করার উপর উম্মতকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। যেহেতু এই ইবাদতের মাঝে রয়েছে চিত্তশুদ্ধি, গোনাহর ময়লা ও দাগ হতে আত্মার প্রক্ষালন। যাতে মুসলিম পরকালে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সমাদর পাবার যোগ্য হয়ে ওঠে। নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করে এবং (সেই হজ্জে) যৌনাচার ও কোন পাপ (বা অন্যায় কাজ) না করে, তবে সে সেই দিনকার মত (নিস্পাপ হয়ে) ফিরে আসে, যেদিন তার জননী তাকে প্রসব করেছিল।" *(বুখারী ১৪৪৯, মুসলিম ১৩৫০নং)*

তিনি আরো বলেন, "এক উমরা হতে অপর এক উমরা, উভয়ের অন্তর্বর্তী কালীন পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। আর (আল্লাহর নিকট) গৃহীত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছু নয়।" *(বুখারী ১৬৮৩, মুসলিম ১৩৪৯নং)*

গৃহীত হজ্জ সেই হজ্জকে বলা যেতে পারে, যে হজ্জ বিশুদ্ধচিত্তে করা হয়, যার সমূদয় রীতি-নিয়ম পালন করা হয়, যা সর্বদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হয়। মঙ্গল ও সদাচার দ্বারা পূর্ণ হয় এবং অনাচার কলুষ ও ঝগড়া-বিবাদ হতে বিশুদ্ধ হয়।

অবশ্য প্রয়োজনে সদ্‌ভাব ও সৌজন্যের সাথে তর্ক করা অবৈধ নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে কোন শরয়ী সমস্যা নিয়ে সদ্‌ভাবে বিতর্ক করাও নিরর্থক, যেমন অন্ধানুকরণ, অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি বিতর্ক ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ৮পৃঃ)*

হজ্জের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক। আল্লাহর পথে জিহাদের পর মর্যাদায় এই হজ্জেরই স্থান

রয়েছে। যেমন পূর্বে এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

ঐ হজ্জের একটি প্রধান অঙ্গ আরাফাত ময়দানে অবস্থান। সকল হাজীকে নবম যুলহজ্জে ঐ ময়দানে কিছুকালও অবস্থান করতেই হয়। যেদিনের মর্যাদা প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন, "আরাফাতের দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই, যাতে আল্লাহ পাক বান্দাকে অধিক অধিক অগ্নিকুন্ড থেকে মুক্ত করে থাকেন। তিনি (ঐ দিনে) নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'কি চায় ওরা?" *(মুসলিম ১৩৪৮নং)*

হজ্জের সমস্ত শর্তাবলী পূর্ণ হলে (ভারপ্রাপ্ত) মুসলিমের উপর ওয়াজেব, সে যেন বিলম্ব না করে সত্বর হজ্জের ফরয আদায় করে। যেহেতু বিনা ওযরে হজ্জ পালনে বিলম্ব বা গয়ংগচ্ছ করলে সে গোনাহগার হবে। *(আল ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ ১১৫ পৃঃ)*

অনেক যুবক হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও ভাবে, এখন হজ্জ করলে ফিরার পর মরণ পর্যন্ত বহু সময় বাকী থাকবে, তাতে পাপও হবে বেশী। তাই মরণের পূর্বকাল বাধক্যের অপেক্ষা করে। অথচ মিসকীন জানে না যে, তার মৃত্যু কখন আসবে। ফলে এইভাবে ফরয আদায়ে অবহেলা করে। অনেকে পিতা-মাতার বর্তমানে হজ্জ হয় না মনে করে। ফলে এই সব খোঁড়া ওজুহাত ও ছল-বাহানা করে যখন মরে, তখন মহাপাপী হয়ে মরে।

সামর্থ্যবান পিতা অথবা অভিভাবকের কর্তব্য তার অধীনে সকল পরিজনের জন্য হজ্জের সুবন্দবস্ত করে দেওয়া, যাতে তারাও নিজের ফরয আদায় করতে সক্ষম হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণের উপর কৈফিয়ত দিতে হবে।" *(বুখারী ৮৫৩, মুসলিম ১৮২৯, তফসীর আযওয়াউল বায়ান ৫/১০৮)*

হজ্জ করার সামর্থ্য ও সুযোগ হওয়ার পর তা অবিলম্বে পালন করার ব্যাপারে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটাই সমালোচনা থেকে খালি নয়। তবে এ বিষয়টি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, আল্লাহর আদেশ পালনে বা কোন সৎকাজে শীঘ্রতা করা ও ফরয আদায়ে প্রতিযোগিতা ও তড়িঘড়ি করা ওয়াজেব। ঐ সমস্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিনা ওজরে ও বাধায় ফরয আদায়ে বিলম্ব করলে গোনাহগার হবে। যেমন, "(ফরয) হজ্জ পালনের জন্য শীঘ্রতা কর। কারণ, তোমাদের কেউ জানে না যে, তার কি অসুবিধা উপস্থিত হতে পারে। *(মুসনাদে আহমাদ ১/৩১৪, ইরওয়াউল গালীল ৪/১৬৮)*

মহান আল্লাহ বলেন,

(   )

অর্থাৎ, "তোমরা প্রতিযোগিতা কর,তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য; যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান; যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা

হয়েছে।” *(কুঃ ৩/১৩৩)*

অন্যত্র তিনি বলেন, ( )

“অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর, *(কুঃ ২/১৪৮)*

হজ্জের শর্তাবলীর মধ্যে সাবালকত্ব ও সামর্থ্য অন্যতম। তবে ছোট নাবালক-বালিকা যদি পিতা-মাতা বা অপর কারো সাথে হজ্জ করে তাহলে সে হজ্জ শুদ্ধ হবে এবং পিতা-মাতা সওয়াবের অধিকারীও হবে। কিন্তু ঐ হজ্জের দ্বারা তাদের ফরয আদায় হবে না। অর্থাৎ সাবালক হওয়ার পর যদি হজ্জের অন্যান্য শর্ত পূরণ হয় তবে তাদের উপর আবার হজ্জ আদায় ফরয হবে।

সামর্থ্য সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন, “মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।” *(কুঃ ৩/৯৭)* আর সামর্থ্যবান সেই ব্যক্তি, যে সশরীরে নিজের উত্তম (হালাল) সম্পদ দ্বারা হজ্জ করার ক্ষমতা রাখে। ধনবল না থাকলে ঋণ করে হজ্জ করা জরুরী নয়। যেমন ঋণগ্রস্ত থাকলে হজ্জ ফরয নয়। *(আল মুমতে’ ৭/৩০)*

যদি কেউ শারীরিক অক্ষম হয় কিন্তু সম্পদে সক্ষম থাকে, তবে দেখতে হবে যে, তার ঐ দৈহিক অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার আশা আছে কি না? যদি বার্ধক্য অথবা চিররোগের কারণে হজ্জে অসমর্থ হয়, তবে সে তার সম্পদ দিয়ে অপরকে নায়েব করে হজ্জ করাবে। আর যদি ঐ অক্ষমতা দূর হওয়ার আশা থাকে, তবে আরোগ্যলাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিজে হজ্জ আদায় করবে। আবার অপেক্ষাকালে যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় তবে ত্যক্ত সম্পদ হতে তার ছেলেরা বা অন্য কেউ (তার নামে) হজ্জ করবে।

যে ব্যক্তি অপরের তরফ থেকে নায়েব হয়ে (অপরের নামে) হজ্জ করবে তার জন্য এক শর্ত যে, সে যেন পূর্বে তার নিজের ফরয হজ্জ আদায় করে থাকে। নিজে হজ্জ না করে থাকলে অপরের নামে হজ্জ হবে না। অনুরূপভাবে উমরাতেও এই সব নীতি মান্য ও পালনীয়। এতে পুরুষের তরফ থেকে নারী অথবা নারীর তরফ থেকে পুরুষ হজ্জ বা উমরাহ করতে পারে।

কারো দ্বারা হজ্জ করলে এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করা উচিত, যে হজ্জের সমস্ত কর্তব্য বা আহকাম জানে এবং নেক ও পরহেযগার লোক হয়, যার হজ্জ কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক আশা রাখা যায়। অনুরূপভাবে প্রতিনিধিরও উচিত, এ কাজে আল্লাহর জন্য তার চিত্তকে বিশুদ্ধ করা। এর মাধ্যমে পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে ইবাদতের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা রাখা। মুসলিম ভায়ের এই ইবাদত আদায় করে তাকে উপকৃত করা এবং অবহেলা না করে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত হজ্জের কর্তব্য আপ্রাণ চেষ্টার সাথে সমাধান করা। যেহেতু একজনের

তরফ হতে ইবাদতে প্রতিনিধিত্ব নেওয়া এক আমানত। এ আমানতে খেয়ানত করা অবশ্যই তার জন্য বৈধ নয়।

যেমন কোন মুসলিমের জন্য এও হালাল নয় যে, সে হজ্জকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম ও সুযোগ বানিয়ে নেয় এবং কেবল অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে অপরের নিকট হতে অর্থ নিয়ে তার প্রতিনিধিরূপে হজ্জ করে। উদ্দেশ্য এই হলে অবশ্যই তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। ওদেরই জন্য পরলোকে আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে। আর ওরা যা করে থাকে (নিয়তে খারাবির জন্য) তা নিরর্থক হবে। *(কুঃ ১১/১৫-১৬)*

অবশ্য হজ্জ আসল উদ্দেশ্য হলে হজ্জের মৌসমে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রুজী অনুসন্ধান করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা বা প্রয়োজনীয় কোন জিনিসপত্র খরিদ করে দেশে আনা দোষের কথা নয়। যদি তা আসল কর্তব্য থেকে বিরত না করে, ব্যবসা হালাল উপায়ে হয় এবং তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান মনে করা যায় তবে। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন, "সুবিদিত মাসে হজ্জ হয়। যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জের এহরাম বাঁধে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-মিলন (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। আর তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা (হজ্জের জন্য) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তাকওয়া (পরহেযগারী বা আত্মসংযম)ই হল শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর। <u>তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহসন্ধানে কোন দোষ নেই।</u> সুতরাং যখন তোমরা আরাফাত হতে (দ্রুত গতিতে) প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারামে (মুযদালেফায়) পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। এবং তিনি যেভাবে নির্দিশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ (তাঁর যিকর) করবে। যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফেরে সেখান থেকেই ফিরে চল। আর আল্লাহর কাছে মার্জনা চাও, বস্তুতঃ আল্লাহ মার্জনাকারী পরম দয়ালু। অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে। এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে (সবকিছু) দাও। বস্তুতঃ তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" *(কুঃ ২/১৯৭-২০২)*

হজ্জে যাওয়ার পূর্বে

মুসলিম হজ্জ করার সংকল্প করলে নিম্নোক্ত কর্মাবলীর অনুসরণ করার চেষ্টা করবে;

১- ইস্তেখারার দুই রাকআত নামায আদায় করে সময়াদি নির্বাচনে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে।

২- বিশুদ্ধ তওবা করে নেবে। কারো কিছু না হক আত্মসাৎ করে থাকলে তা প্রত্যার্পণ করবে, কারো প্রতি যুলুম করে থাকলে তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে, ঋণ থাকলে পরিশোধ করে দেবে, কারো আমানত থাকলে তা ফেরত দেবে, কাউকে অসিয়ত করার থাকলে লিখে দেবে। কারণ, সে বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা তা জানে না। পরিবার-পরিজনের জন্য পরিমিত খরচ-পাতি দিয়ে যাবে, পিতা-মাতা বা তত্তুল্য কেউ থাকলে তাদের সম্মতি নিয়ে ও তাদেরকে সন্তুষ্ট করে যাবে। চাকুরী থাকলে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছুটি নেবে। *(মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৭)*

৩- পথের জন্য যথেষ্ট সম্বল সাথে করে নেবে। সম্ভব হলে বেশী বেশী পাথেয় সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনে অপরের সাহায্য করবে। তবে এই পাথেয়র সবটুকুই হালাল মাল থেকে হওয়া একান্ত জরুরী। যেমন সফরের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীরুতা এক মহা সম্বল। যেহেতু তাকওয়াতে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি সঞ্চয় হয়, সঙ্কটের মুহূর্তে সুরাহা সৃষ্টি হয়, সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায়, পাপ মোচন হয় এবং মহাপুরস্কার লাভ হয় ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন,

(( ))

অর্থাৎ, "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। আর তাকওয়াই হল শ্রেষ্ঠ পাথেয়। *(কুঃ ২/১৯৭)* জ্ঞাতব্য যে, এমন সফরে তাওয়াক্কুল এর নাম নিয়ে সম্বল ছাড়াই বের হওয়া প্রকৃত তাওয়াক্কুল নয়, বিদআত। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ৪৮পৃঃ)*

৪- হজ্জের সফরের জন্য সহায়ক, সওয়াব-প্রিয় নেক সঙ্গী নির্বাচন করবে। একাধিক সাথী হলেই উত্তম। জামাআতে একজন আলেম হলে তো সোনায় সোহাগা। যিনি হজ্জের বিভিন্ন আহকামে সতর্ক করবেন, সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করবেন, সারা সময়টাকে তেলাঅত, যিক্র বা কোন হজ্জ সম্পর্কিত কিতাব পঠনের মাধ্যমে কাটাতে প্রয়াসী হবেন।

৫- নামায কসর ও জমা করা ইত্যাদি সহ সফরের বিভিন্ন কর্তব্য জানবে। হাজী মহিলা

হলে তার সহিত স্বামী অথবা কোন মাহরাম (যার সঙ্গে ঐ মহিলার চিরতরে বিবাহ হারাম যেমন, জ্ঞাতিত্বে পিতা, পুত্র, (আপন বা সৎ) ভাই, চাচা। দুগ্ধ সম্পর্কে, দুধ পিতা, পুত্র, দুধ ভাই বা চাচা। বৈবাহিক সম্বন্ধে (আপন) জামাই বা শ্বশুর ইত্যাদি থাকা জরুরী। এবং এও জরুরী যে, সে মাহরাম যেন সাবালক ও সুস্থ জ্ঞান ও মস্তিষ্কের হয়। কারণ, তাছাড়া একজন মহিলার সুসংরক্ষণ সম্ভব নয়।

মহিলার সহিত মাহরাম শর্ত হওয়ার ব্যাপারে তার যুবতী বা বৃদ্ধা হওয়ায় কোন পার্থক্য নেই। যেমন সফর দীর্ঘ হোক অথবা ছোট, পানি, স্থল বা বিমান পথ হোক, হজ্জের বা অন্য কোন সফর হোক সর্বক্ষেত্রে সকল সফরের জন্য এই শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী। যেহেতু এ বিষয়ে প্রিয় রসূল ﷺ এর সাধারণ উক্তি, "মাহরাম ছাড়া মহিলা যেন সফর না করে।" *(বুখারী ১৭৬৩, মুসলিম ১৩৪১নং)*

প্রকাশ যে, মুখে পাতানো ভাই, পীর (?) ভাই, চাচাতো, ফুফাতো, খালাতো, মামাতো ভাই, দেওর, ভাশুর, পোষ্যপুত্র ইত্যাদি আপন ভাই বা পুত্র হয় না, তারা মাহারেম নয় এবং তাদের সহিত সফর বৈধ নয়।

জামাআতে কতকগুলি বিশ্বস্ত মহিলা হলেও তারা কোন মহিলার মাহরামের বিকল্প হতে পারে না। যারা এ অভিমতকে সমর্থন করেন তাঁদের ভিত্তি দুর্বল এবং পূর্বোল্লেখিত সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, 'আল্লাহর ও তাঁর রসূল (মহিলার সফরের ব্যাপারে) যে শর্ত আরোপ করেছেন সেই শর্ত আরোপ করাই অধিক উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং তার যুক্তিও স্পষ্ট। যেহেতু নারী দুর্বল। প্রতিরক্ষা ও হেফাযত ছাড়া সহসায় বিপদের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে সফরে ওঠা-নামা ইত্যাদির ব্যাপারে নারী সহায়তার মুখাপেক্ষিনী হয়। অতএব এমন সহায়কের দরকার যে তার প্রয়োজন মিটাবে, দেহ স্পর্শ করে অন্যান্য সহায়তা করবে। সে এবং তার সঙ্গিনী অন্যান্য নারীদের জন্যও একই সাহায্যের প্রয়োজন। আর মাহরাম ব্যতীত এ কাজে কারো সহায়তায় নিরাপত্তা নেই; যদিও (ঐ গায়ের মাহরাম) সর্বশ্রেষ্ঠ মুত্তাকী বা ভাল লোক হয়। যেহেতু হৃদয়-মন শীঘ্র পরিবর্তনশীল এবং শয়তান সুযোগ সন্ধানী। আর চরিত্র বিজ্ঞানী প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন নারীর সহিত কোন (গায়ের মাহরাম) পুরুষ নির্জনতাবলম্বন করলেই শয়তান তাদের তৃতীয় (কোটনা) হয়।" *(মুসনাদে আহমাদ ১/২৬, তিরমিযী ২১৬৫নং)*

বিধবা ইদ্দতে থাকলে হজ্জের সফরে বের হতে পারে না। ইদ্দতের সময় পার করে মাহরামের সাথে সফরে বের হবে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতে থাকলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে কোন মাহরামের সাথে হজ্জ করতে পারে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৭৪)*

৬- জামাআতবদ্ধ হাজীদের উচিত, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, ধৈর্যশীল ও সফর বিষয়ে বহুদর্শী কোন একজনকে আমীর বা নেতা নির্বাচন করা। যিনি সকলের পরামর্শ নিয়ে নেতৃত্ব দেবেন। এক একজনের উপর যথোপযুক্ত কার্যভার অর্পণ করবেন; যাতে যৌথভাবে সকলের পক্ষে সফরের ভার হাল্কা হবে। অবশ্য এই স্বার্থে অন্যান্যদের উচিত, যাতে সকলের লাভ আছে এবং যা শরীয়ত পরিপন্থী নয় তাতে আমীরের আনুগত্য করা। এ বিষয়ে আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "যখন কোন তিনজন সফরে বের হবে তখন তাদের জন্য জরুরী, একজনকে আমীর নির্বাচন করা।" *(আবূ দাঊদ ২৬০৯নং)*

৭- সফরে বিভিন্ন আদব-কায়দার অনুসরণ করবে। যেমন, ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ, গাড়ি চড়ার দুআ, পরিজনকে বিদায়কালীন দুআ পড়া, নেক লোকদের কাছ থেকে অসীয়ত ও নসীহত চাওয়া, কোন স্থানে অবস্থানকালে দুআ পাঠ, উঁচু পথে চড়ার সময় তকবীর পড়া, নীচু পথে নামার সময় তসবীহ পড়া, পথের মধ্যে অবস্থান না করা ইত্যাদি।

৮- সফরের সদাচারে চরিত্রবান হবে। পথ ও হজ্জ আদায়ের কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করবে। অপরের ভুল সহ্য ও ক্ষমা করবে, নম্রতা, সদ্ব্যবহার, স্বার্থত্যাগ, পরহিতৈষণা ব্যবহার করবে। হিংসা, বিতর্ক ও বিবাদ থেকে দূরে থাকবে। আমীরের আনুগত্য করবে। সঙ্গীদের অভিমতের বিপরীত একাকী কোন ভিন্ন মত নিয়ে তাদের বিরোধিতা করবে না। আপোসে পরস্পরের খিদমত করতে প্রয়াসী হবে। যথাসম্ভব নিজের খিদমত নিজে করবে এবং অপরের খিদমত করতে ও যথাসম্ভব অপরের নিকট থেকে খিদমত না নিতে চেষ্টা করবে। বাজে কথা, অসার বাক্য ও গালি-মন্দ করা থেকে জিহ্বাকে হিফাযত করবে। অতিরিক্ত মজাক-ঠাট্টা করবে না। একে অপরের প্রতি অহমিকা প্রকাশ করবে না। সময়ের যথোচিত সদ্ব্যবহার করা সহ অন্যান্য সৎ গুণাবলী ধারণ করবে।

সাধারণ মুসাফিরের এই আদব ও শিষ্টাচার ছাড়াও খাস হাজীদের মধ্যে বিশেষ গুণ থাকা উচিত। যেমন, প্রতিকাজে ইখলাস (বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর তুষ্টিলাভের ইচ্ছা), আল্লাহ-ভীরুতা (তাকওয়া), আল্লাহর নির্দেশাবলীর যথার্থ সম্মান, অপরকে কষ্ট না দেওয়া, বিশেষ করে তওয়াফ (কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ), সায়ী (সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে যাওয়া-আসা) ও রমই জিমার (পাথর মারা) কালে ভিঁড়ের চাপে নিজেকে সামলে নেওয়া এবং ধাক্কায় অপরকে কষ্ট না দেওয়া, অজ্ঞ মানুষ (যেমন যারা কাঁধ বের করে নামায পড়ে, অসময়ে পাথর মারে তাদেরকে) সঠিক জ্ঞান দান করা, হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে তার

ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া বা পথ নির্দেশ করা। হজ্জের সকল অনুষ্ঠান কেবল আল্লাহরই তা'যীম হৃদয়ে-মনে-মুখে রাখা; হজ্জ পালনে ও সর্বকাজে সুন্নাহর অনুসরণ করা। ইত্যাদি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মুসলিমের কোনও আমল কেবল দু'টি কষ্ঠিপাথরে বিচার করে গৃহীত হয়। ইখলাস (কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষবিধান) ও ইত্তেবা (রসূলের অনুসরণ, অর্থাৎ সমস্ত আমল তাঁর নির্দেশ ও পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া); এই দু'য়ের একটির অভাব হলে কোন আমল কবুল হয় না।

মীকাত

মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলাইফাহ বা আবইয়ারে আলী, সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য জুহফা বা রাবেগ। নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযেল, সাইল বা ওয়াদী মাহরিম। ইরাক, ইরান ও পূর্বদেশীয়দের জন্য যাতে-ইর্ক। ইয়ামান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, বর্মা প্রভৃতি দেশবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম বা সা'দিয়াহ। এবং এই দেশবাসী ছাড়া যারা এর উপর দিয়ে আসবে তাদের জন্যও উক্ত স্থানগুলো মীকাত। কিন্তু যারা উক্ত মীকাত ও মক্কার মধ্যকার বাসিন্দা তাদের মীকাত তাদের নিজেদের বাসস্থানই। তদনুরূপ মক্কাবাসীদের মীকাত তাদের আপন-আপন গৃহ। প্রকাশ যে, জিদ্দা কোন বহিরাগতদের জন্য মীকাত নয়।

ইহরাম

উমরার রুক্ন তিনটি; ইহরাম, তওয়াফ ও সায়ী। এর ওয়াজেব দু'টি; মীকাত (উপরোক্ত ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) থেকে ইহরাম বাঁধা এবং মস্তক মুন্ডন বা কেশ কর্তন করা।

হজ্জের রুক্ন চারটি; ইহরাম, আরাফাতে অবস্থান, তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ইফাযাহ ও সায়ী। আর এর ওয়াজেব সাতটি; মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা, সূর্যোদয় পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন, জামারাতে পাথর মারা, মস্তক মুন্ডন অথবা কেশ কর্তন করা, মিনায় রাত্রি বাস করা এবং বিদায়ী তওয়াফ করা। জ্ঞাতব্য যে, হজ্জ বা উমরার কোন রুক্ন বাদ পড়ে গেলে হজ্জ বা উমরাহ হয় না। পুনরায় আগামীতে তাকে হজ্জ বা উমরাহ (ফরয হলে) করতে হয়। কিন্তু কোন ওয়াজেব ছুটে গেলে ফিদইয়্যাহ লাগে, হজ্জ হয়ে যায়।

হজ্জ বা উমরার প্রথম রুক্ন ইহরাম। যা ঐ ইবাদতে প্রবেশের সঙ্কল্প (নিয়ত) করাকে

বুঝানো হয়। আর যা কেবল ইহরামের কাপড় পড়ারই নাম নয়। যেহেতু মুহরিম (ইহরাম যে বাঁধে) ইহরাম বেঁধে নানাবিধ পোশাক-পরিচ্ছদ, সুগন্ধ, বিবাহ-যৌনাচার প্রভৃতি আরো অনেক বস্তু যা তার জন্য পূর্বে হালাল ছিল তা নিজের উপর হারাম করে নেয়। *(মুফীদুল আনাম ১/১২)*

ইহরাম বাঁধার নিয়ম

হাজী অথবা মু'তামির (ওমরাহকারী) যখন মীকাতে (অথবা তার বরাবর) পৌঁছবে তখন তার জন্য মুস্তাহাব যে, সে অপ্রয়োজনীয় চুল বা লোম ও নখ পরিষ্কার করে নেবে। অবশ্য এটা ইহরামের কোন অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নয়। তবে প্রয়োজনে কর্তব্য নিশ্চয় বটে। (অবশ্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার নিয়ত থাকলে তা করবে না।)

এরপর গোসল করবে। *(দেখুন, তিরমিযী ৮৩০নং, দারেমী ২/৩১, ইবনে খুযাইমা ২৫৯৫নং, ত্বাবারানীর কাবীর ৪৮৬২নং, দারাক্বুতনী২/২২০বাইহাক্বী ৫/৩২, হাকেম ১/৪৪৭, আল-মুমতে' ৭/৬৮)* হায়েয ও নিফাস-ওয়ালী মহিলাও পবিত্রা মহিলার মতই গোসল করে ইহরাম বাঁধবে। যেহেতু হায়েয ইহরামের প্রতিবন্ধ নয়। *(মাজমু ফাতাওয়া ২৬/১০৯)*

পুরুষরা দেহে সুগন্ধি লাগাবে, তবে ইহরামের কাপড়ে নয়। সাদা ও পরিষ্কার একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও একটি চাদর এবং চটি বা চপ্পল পরবে। লুঙ্গি না পেলে পায়জামা এবং জুতা না পেলে (চামড়ার) মোজা পরবে। *(বুখারী ১৭৪৬, মুসলিম ১১৭৮-নং)*

মহিলা যে কোন কাপড়ে ইহরাম বাঁধতে পারে। তবে যেন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক রঙিন বা সৌন্দর্য-খচিত পোশাক না হয়। কারণ তাতে সওয়াব কমতে থাকবে। মহিলার ইহরামের জন্য কোন নির্দিষ্ট রঙ বা ধরনের কাপড় নেই। 'অরাস' বা জাফরান অথবা অন্য কোন সুগন্ধ মিশ্রিত কাপড়ে ইহরাম বাঁধা যাবে না। আর এতে পুরুষ ও মহিলা সকলেই সমান। *(বুখারী ১৪৬৮, মুসলিম ১১৭৭নং, ফাতহুল বারী ৪/৫২)*

মহিলা নেকাব ও দস্তানা পরবে না। *(বুখারী ১৭৪১নং)* দস্তানা; যা মহিলারা হাতের পর্দার জন্য ব্যবহার করে তা না পরলেও কাপড় (বোরকা বা চাদর দ্বারা) হাত ঢেকে নেবে। নেকাব; যা চক্ষুদ্বয় বাইরে রেখে চেহারায় বাঁধা হয়। গায়র মাহরাম পুরুষের নজর থেকে বাঁচতে মহিলার জন্য চেহারায় ওড়না বা চাদরের পর্দা রাখা ওয়াজেব এবং চেহারাকে পর্দার কাপড় থেকে দূরবর্তী করা কোন জরুরী নয়। পায়ের মোজা পরতে পারে, বরং তা পায়ের পর্দার জন্য উত্তম।

পুরুষও দস্তানা ব্যবহার করবে না। অনুরূপভাবে বুট বা ঐ জাতীয় জুতা এবং মোজা পরবে না। তবে চটি জুতা না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যায়।

শিশুদের ইহরাম বড়দের মতই। সেলাই করা পোশাক এবং অন্যান্য ইহরামের অবৈধ বস্তু ও কর্মাদি হতে তাকে দূরে রাখা তার অভিভাবকের জন্য ওয়াজেব। যদিও অধিক ভিঁড় ও কষ্টের কারণে ছোটদের হজ্জ ও উমরা না করাই উচিত তবুও সুযোগে করলে করতে পারে।

অতঃপর লেবাসাদি পরে যদি ফরয নামাযের সময় হয় তবে (যোহর, আসর বা এশার) দুই রাক্‌আত (কসর) নামায পড়বে এবং তারপর ইহরাম বাঁধবে। যদি নামাযের সময় না হয় তবে ওযুর সুন্নতের নিয়তে দুই রাকআত সুন্নত পড়বে -যদিও বা সে সময়ে নফল নামায নিষিদ্ধ হয়। এ ছাড়া ইহরামের জন্য কোন নির্দিষ্ট সুন্নত নামায নেই। অবশ্য মীকাত যুলহুলাইফা হলে এখানে নামায পড়া মুস্তাহাব। ইহরামের জন্য নয়; বরং স্থান (ওয়াদিয়ে আকীক) ও তার বর্কতের জন্য। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ১৫পৃঃ)*

নামায শেষে গাড়িতে বসে মনে মনে উমরার নিয়ত করবে এবং বলবে, '**লাব্বাইকা উমরাহ**।' হজ্জের নিয়ত করবে ও বলবে, '**লাব্বাইকা হাজ্জা**', উভয়ের নিয়ত করে বলবে, '**লাব্বাইকা হাজ্জাঁউ অ উমরাহ**।' '**সুবহানাল্লাহি অল হামদুলিল্লাহি অল্লাহু আকবার, লাব্বাইকা উমরাহ**' বলাও ভাল। *(বুখারী ১৫৫১নং)*

এ সময় '**আল্লাহুম্মা হাযিহী হাজ্জাহ, লা রিয়াআ ফীহা অলা সুমআহ**'- (অর্থাৎ, এটা এমন হজ্জ যাতে কোন লোকপ্রদর্শন নেই, নেই কোন সুনামের ইচ্ছা।) এ দুআও বলা উত্তম। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ১৬পৃঃ)*

মুহমির রোগ, শত্রুভয় ইত্যাদির কারণে হজ্জ পালন পূর্ণ না হওয়ার আশঙ্কা করলে তার পক্ষে শর্ত লাগানো উত্তম। সে ক্ষেত্রে বলবে, 'যদি কোন অবরোধক আমাকে অবরুদ্ধ করে তবে সেই অবরোধের স্থানই আমার হালাল হওয়ার স্থান।' এই শর্ত শুরুতে লাগালে হজ্জ বা উমরা আদায়ে কোন বাধা এলে মুহরিমের জন্য হালাল হওয়া বৈধ হবে এবং তার উপর কোন কুরবানী আদি ওয়াজেব হবে না। অন্যথায় কুরবানী ওয়াজেব।
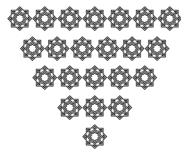
তালবিয়াহ

অতঃপর গাড়িতে চড়ে কিবলামুখী হয়ে তালবিয়াহ পাঠ করতে শুরু করবে। পুরুষ উচ্চস্বরে এবং মহিলা চুপে চুপে পড়বে। অবশ্য ফিতনার ভয় না থাকলে বা গাড়ির ভিতর কেবল মাহারেমের সাথে থাকলে মহিলারাও সশব্দে পড়বে। জামাআতবদ্ধভাবে সমস্বরে একই সঙ্গে অথবা একজনের বলার অনুকরণ করে পড়বে না।

তালবিয়াহ হজ্জের এক নিদর্শন ও প্রতীক। *(আহমাদ ২/৩২৫)* আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক তালবিয়াহ পাঠকারী যখন তালবিয়াহ পাঠ করে, তখন তার ডাইনে ও বামে প্রত্যেক গাছপালা এবং পাথর-মাটিও তালবিয়াহ পড়ে থাকে। *(বাইহাকী ৫/৪৩)*

নবী ﷺ এর পঠিত তালবিয়াহ পড়াই উত্তম;

.

( )

উচ্চারণঃ- *লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা অন্নি'মাতা লাকা অলমুল্ক, লা শারীকা লাক। (লাব্বাইকা ইলা-হাল হাক্ক)*

অর্থঃ- আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই। (আমি হাজির, হে সত্য মা'বূদ!)

এই তালবিয়াহ বেশী বেশী করে পড়বে এবং অন্যান্য যিক্র ও দুআ আদিও পাঠ করতে থাকবে। এই তালবিয়াহ উপর বাড়তি অন্য কিছু না বলাই উত্তম। তবে নিম্নের দুআ বাড়তি বলা যায় ঃ-

'লাব্বাইকা যাল মাআরিজ, লাব্বাইকা যাল ফাউয়াযিল।'

অর্থাৎ, আমি হাজির, হে সোপানশ্রেণীর মালিক! আমি হাজির, হে বৃহৎ নেয়ামতসমূহের মালিক! .

'লাব্বাইক অসা'দাইক, অল্খায়রু বিয়্যাদাইক, অররাগবা-উ ইলাইকা অল্আমাল।'

অর্থাৎ, আমি হাজির, আমি হাজির। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, সকল আগ্রহ ও কর্ম তোমার প্রতি। *(ঐ ১৬পৃঃ)*

মুহরিম যদি কারো প্রতিনিধি হয় তাহলে বলবে, 'লাব্বাইকা উমরাতান' অথবা 'হাজ্জান আন (-----)।' এবং 'আন' বলে আসল কর্তার নাম নেবে।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকারের; তামাত্তু, ক্বিরান ও ইফরাদ। সবচেয়ে উত্তম হল তামাত্তুর ইহরাম বাঁধা। তামাত্তুর অর্থ; হজ্জের মাসে প্রথমে কেবল উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা, অতঃপর উমরাহ সেরে হালাল হয়ে পুনরায় ঐ সফরেই হজ্জের ইহরাম বাঁধা। এই ইহরাম বিশেষ করে তাদের জন্য বেশী ভালো যারা বহু পূর্বেই হজ্জের মাসে মক্কা শরীফে পৌঁছে থাকে। যাতে তারা উমরাহ করার পর হালাল হয়ে হজ্জের ইহরাম পর্যন্ত 'তামাত্তু' (ফায়দা) লাভ করে থাকে।

তামাত্তুর বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যেহেতু সাহাবাগণ যখন (নবী -এর সহিত হজ্জে গিয়ে) তওয়াফ ও সায়ী শেষ করলেন, তখন তিনি যাঁরা সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) এনেছিলেন তাঁদেরকে ছাড়া সকলকে উমরাহ (গণ্য) করে তামাত্তু করতে আদেশ করলেন। যেহেতু তিনি নিজে সঙ্গে হাদী এনেছিলেন, তাই উমরাহ গণ্য না করে হজ্জের অপেক্ষা করলেন এবং তামাত্তু না করতে পেরে আফসোস করলেন। অতএব তামাত্তু উত্তম বলেই তাঁদেরকে এই আদেশ করেছিলেন এবং নিজেও তামাত্তু করার জন্য আফসোস করেছিলেন। বলেছিলেন, "যদি হাদী না আনতাম তাহলে আমি উমরাহ করতাম। এবং হালাল হয়ে যেতাম।"

অধিকন্তু তামাত্তু হজ্জে আমল অধিক থাকে, তাতে পৃথকভাবে পূর্ণ উমরাহ থাকে এবং পূর্ণ হজ্জেরও আমল থাকে।

তামাত্তু হজ্জে ফায়দা লাভের শুকরিয়া হিসাবে এবং দুই সফরের এক সফর সংক্ষিপ্ত হবার শুকরানার জন্য হাদী (কুরবানী) ওয়াজেব। যদি হাজী তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে (ঈদের পর পর) ৩ দিন এবং বাড়ি ফিরে ৭ দিন সর্বমোট ১০ দিন রোযা পালন করবে। *(কুঃ ২/১৯৬)*

এক সঙ্গে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করে এহরাম বাঁধলে অথবা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে পরে ঐ সঙ্গে হজ্জ করলে ক্বিরান হজ্জ হয়। ক্বিরান হাজীর উপরও কুরবানী ওয়াজেব। না পারলে ঐরূপ দশ দিন রোযা পালন করবে।

কেবলমাত্র হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধলে ইফরাদ হজ্জ হয়। এই হজ্জে কুরবানী ওয়াজেব নয়।

যে ব্যক্তি ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধে, অথবা ক্বিরান হজ্জের ইহরাম বাঁধে কিন্তু সঙ্গে হাদী আনে না তার জন্য উত্তম যে, মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরাহ করে (তওয়াফে কদুম ও সায়ী করে এবং চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর ইহরাম খুলে দিয়ে পুনরায় তারবিয়ার

দিনে (৮ই যুল হজ্জ) হজ্জের ইহরাম বাঁধবে; অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ করবে। অনেকে এরূপ করাটাকে ওয়াজেব বলেছেন। *(যাদুল মাআদ ২/ ১৮৫, মুফীদুল আনাম ১/ ১৩০)*

ইহরামে অবিধেয়

ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য যা কিছু করা অবৈধ তা সাধারণতঃ তিন প্রকার। প্রথম প্রকার অবিধেয় যা নারী-পুরুষ সকলের জন্য সাধারণ এবং তা ৮ রকম;

১- মুন্ডন বা অন্য কোন প্রকারে মস্তকের কেশ দূরীকরণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত না হয় তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না। *(কুঃ ২/ ১৯৬)*

তদনুরূপ দেহের মধ্যে কোন প্রকারের লোম তোলা বা ছিঁড়া মুহরিমের জন্য অবিধেয়।

২- হাত অথবা পায়ের নখ তোলা বা কাটা। যেহেতু এটাও দেহের কোন অংশ দূর করা; যাতে বিলাসিতা লাভ হয়।

৩- শরীর, বস্ত্র, খাদ্য অথবা পানীয়তে সুগন্ধি ব্যবহার করা। *(বুখারী ১২০৬, মুসলিম ১২০৬নং)*

৪- দস্তানা বা হাতমোজা ব্যবহার করা।

৫- স্বামী-স্ত্রীর কামজ আলিঙ্গন, চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি যৌনাচার।

এই পাঁচটি অবিধেয়র কোনটিতে আলিপ্ত হয়ে পড়লে এখতিয়ারের সাথে তিন প্রকার 'ফিদইয়াহ, (জরিমানা) আছে। যেমন আল্লাহপাক মস্তক মুন্ডনের ব্যাপারে বলেন, "অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে, অথবা মাথায় কোন ব্যাধি থাকলে (এবং তার জন্য মস্তক মুন্ডন করতে হলে) তবে (তৎপরিবর্তে) সে রোযা রাখবে কিংবা সাদকাহ করবে, কিংবা কুরবানী দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে।" *(কুঃ ২/ ১৯৬)*

সুতরাং এই জরিমানা আদায়ে এখতিয়ার আছে। ইচ্ছা করলে তিন দিন রোযা পালন করবে কিংবা ছয়টি মিসকীন (নিঃস্ব)কে মাথা পিছু অর্ধ সা (সওয়া এক কিলো) করে খাদ্য (চাল) দান করবে। অথবা একটি ছাগ বা মেষ কুরবানী দিবে। (আর এই খাদ্য ও মাংস হারাম শরীফের মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে হবে।) যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ কা'ব বিন উজরাহকে বলেছিলেন, "সম্ভবতঃ তোমার মাথার উকুণগুলি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে?" বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমার মাথা মুন্ডন করে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ, কিংবা ছয়টি মিসকীন খাওয়াও, কিংবা একটি ছাগ কুরবানী কর।" *(বুখারী ১৭১৯, মুসলিম ১২০১নং)*

আর মস্তক মুন্ডনের উপর নখ কাটা, মোজাদি পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও যৌনাচার করাকে কিয়াস করা হয়েছে। যেহেতু এগুলিও বিলাসিতার মধ্যে পড়ে; যা ইহরাম অবস্থায় অবৈধ।

৬- যোনিপথে সহবাস করা। সহবাস যদি প্রথম হালাল ([1]) হওয়ার পূর্বে হয় তাহলে হজ্জই নষ্ট হয়ে যাবে। তবুও বাকী আমল শেষ করবে। একটি উঁট অথবা গরু কুরবানী করবে এবং পরের বছরে পুনরায় নতুন করে কাযা হজ্জ করবে। স্ত্রী সহবাস ব্যতীত কোন এমন অবিধেয় কাজ নেই, যা প্রথম হালালের পূর্বে ইহরাম বিনষ্ট করে ফেলে। তাই এটা সবচেয়ে বড় অবিধেয় কর্ম। যাতে বড় কাফ্ফারা ও কাযা জরুরী করা হয়েছে।

৭- বিবাহ। মুহরিম নিজে বিবাহ করতে পারবে না এবং অপরের অভিভাবক বা উকীল হয়ে বিবাহ দিতেও পারবে না এবং পয়গামও দিবে না। অবশ্য এই অবিধেয় করে ফেললে কোন ফিদইয়াহ নেই, কিন্তু বিবাহ শুদ্ধ হবে না। *(মুসলিম ১৪০৯নং)*

৮- অগৃহপালিত স্থলচর পশু যবেহ বা শিকার করা। আল্লাহ পাক বলেন "হে মুমিনগণ! ইহরামে থাকা কালে তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে, যা বধ করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার মীমাংসা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। (যার মাংস হারামের ফকীরদের মাঝে বন্টন করা হবে।) অথবা ওর বিনিময় হবে দরিদ্রকে (ওর সমপরিমাণ) অন্নদান, কিংবা সমপরিমাণ রোযা পালন করা, (প্রতি মিসকীনের পরিবর্তে একটি রোযা)। যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন, আর কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" *(কুঃ ৫/৯৬ আয়াত)*

অনুরূপভাবে শিকার কার্যে সাহায্য করা এবং হারামের কোন শিকারকে তার স্থান হতে তাড়িত ও চকিত করা বৈধ নয়। হারামের গাছ ও ঘাস কাটা, প্রচার ও ফিরতের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পরিত্যক্ত মাল কুড়ানো অবৈধ।

প্রকাশ থাকে যে, মিনা ও মুযদালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত। আরাফাত হারামের মধ্যে নয়।

( ) কুরবানীর দিন পাথর মেরে কেশ মুন্ডন অথবা কর্তন করার পর প্রথম হালাল হয়; যাতে স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য অবিধেয় বৈধ হয়ে যায়।

ইহরামে অবিধেয় কর্মসমূহের দ্বিতীয় প্রকার যা কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, তা দুই রকম ঃ-

১- মস্তক সংলগ্নে কোন আবরণ (যেমন; টুপী, পাগড়ী ইত্যাদি শিরস্ত্রাণ) ব্যবহার করা। কিন্তু যা মস্তকের সংলগ্ন নয় বা মাথার সঙ্গে লেগে থাকে না এমন কোন আবরণ বা আচ্ছাদন (যেমন, ছাদিত গাড়ি, তাঁবু, পল্লবিত বৃক্ষ, ছাতা ইত্যাদি) ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তদনুরূপ, মাথায় কোন বোঝা তোলা বা বহন করা (যদি মাথা ঢাকার নিয়ত না হয় তবে) দূষণীয় নয়। *(মুসলিম ১২৯৮-নং)*

২- কোন প্রকারের সিলাইকৃত বস্ত্র পরিধান করা যেমন; জামা, পায়জামা, লুঙ্গি, গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি। অবশ্য আংটি, চশমা, ঘড়ি, বেল্ট, অর্থাদি রাখার ব্যাগ ইত্যাদি (সেলাইকৃত হলেও) ব্যবহার করতে পারে।

অবিধেয় কর্মসমূহের তৃতীয় প্রকার যা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। আর তা হচ্ছে কোন প্রকারে চেহারা আবৃত করা। কিন্তু কোন বেগানা পুরুষ সামনে এলে চেহারা আবৃত করা ওয়াজেব। যা অন্যান্য সাধারণ দলীলাদি সাব্যস্ত করে।

এই অবিধেয় কর্মগুলির কোন একটায় জড়িয়ে পড়লে তার কাফ্‌ফারাও পূর্বেকার মত। পক্ষান্তরে যারা এই সমস্ত অবিধেয় কর্মে আলিপ্ত হয় তাদের তিন অবস্থা হতে পারে;

১- কেউ বিনা ওজর ও বিনা প্রয়োজনে করে। এই অবস্থায় সে গোনাহগার হবে এবং তার উপর ফিদইয়া ওয়াজেব; যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

২- কেউ কোন প্রয়োজন ও অসুবিধায় পড়ে করে। অমতাবস্থায় সে গোনাহগার হবে না তবে তার জন্য ফিদইয়া দেওয়া জরুরী হবে। যেমন কেউ যদি মাথায় ঘা অথবা জখমীর কারণে চুল কাটে অথবা প্রচন্ড শীতের জন্য মাথা ঢাকে ইত্যাদি। *(মজমূ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৬/১১৩)*

৩- কেউ অজান্তে ভুলে, কারো তরফ থেকে নিরুপায় অথবা নিদ্রাবস্থায় করে ফেলে। এমতাবস্থায় তার উপর গোনাহ নেই এবং ফিদ্‌ইয়াও নেই। কিন্তু যখনই এই সমস্ত ওজর ও আপত্তি দূর হয়ে যাবে তখনই ঐ অবিধেয় পরিত্যাগ করা জরুরী হবে। আল্লাহ পাক বলেন,

( )

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। *(কুঃ ২/২৮৬)* আর তাঁর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃত এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয় তার (পাপ)কে

অতিক্রম (ক্ষমা) করেন।" *(ইবনে মাজাহ ২০৪৫নং)* অতএব যে ইহরাম অবস্থায় ভুলে পায়জামা বা গেঞ্জি পরে নেয়, কিংবা মাথা ঢেকে নেয় অথবা অজান্তে নখ ইত্যাদি কেটে ফেলে তবে তার কোন পাপ নেই এবং ফিদইয়াও নেই। কিন্তু স্মরণ হওয়া মাত্র তার পক্ষে ওয়াজেব তা বর্জন করা।

মুহরিম গা-মাথা ধুতে পারে, চুলকাতে পারে। যদি তাতে দু' একটা চুল খসেও পড়ে তবে তা কোন দূষণীয় নয়। তদনুরূপ এহরাম বাঁধার পূর্বে দেহে ব্যবহৃত সুগন্ধির অবশিষ্ট কিছু যদি ইহরাম অবস্থায় হাতে লেগে যায় তবে তাও দোষের নয়। যেমন তার জন্য ইহরামের কাপড় পরিষ্কার ও পরিবর্তন করাও বৈধ। *(ফতহুল বারী ৩/৪০৫)*

প্রকাশ যে, হজ্জে যে ভুলে বা ওয়াজেব ত্যাগে ফিদইয়্যা জরুরী সেই কাজ কয়েকটি করে ফেললে শেষে একটি ফিদয়্যাই যথেষ্ট হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসুল ইসলামিয়্যাহ ২৩/৯৪)*

উমরাহ ও হজ্জের পদ্ধতি

মুহরিম যখন মক্কার নিকট পৌছবে তখন প্রবেশের পূর্বে তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। মক্কায় প্রবেশ করে অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না হয়ে সোজা কা'বা শরীফের প্রতি রওনা দেওয়া উচিত। ওযু করে হারামের মসজিদে (অনুরূপ প্রতি মসজিদেই) প্রবেশের সময় ডান পা আগে বাড়ানো এবং '**বিসমিল্লাহ, অস সালাতু অসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আউযু বিল্লাহিল আযীম, অবি অজহিহিল কারীম অ সুলত্বানিহিল কাদীম, মিনাশ শাইত্বানির রাজীম**।' অথবা '**আল্লাহুম্মাফ্ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক**' বলা সুন্নত। প্রকাশ থাকে যে, মসজিদুল হারাম প্রবেশের সময় এ সাধারণ দুআ ছাড়া ভিন্ন কোন নির্দিষ্ট দুয়া নেই।

অতঃপর কা'বা নজরে পড়লে দুই হাত তুলতে পারে, তবে কা'বা দর্শনের সময় কোন পঠনীয় দুআ শুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অবশ্য এই সময় হযরত উমর -এর দুআ '**আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম, অমিন্‌কাস সালাম, ফাহাইয়্যিনা রাব্বানা বিসসালাম**' পড়া উত্তম। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ২০পৃঃ)*

৪- অতঃপর কাবা শরীফের নিকট পৌছনর পর তালবিয়াহ বন্ধ করবে (যদি উমরা অথবা তামাত্তু হজ্জ করে তবে) এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায না পড়ে তওয়াফ শুরু করবে। তবে যদি ফরয নামাযের সময় যাবার ভয় থাকে অথবা জামাআত ছুটার ভয় থাকে তাহলে ঐ নামায পড়ে তওয়াফ করবে। সর্বাগ্রে হাজারে আসওয়াদের নিকট যাবে এবং তা

চুম্বন করবে। সম্ভব হলে তার উপর (আল্লাহকে) সিজদা করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ডান হাত লাঠি দ্বারা স্পর্শ করে হাতে চুমা দেবে। যদি লাঠি না থাকে অথবা ভিঁড়ের চাপে তা সম্ভব না হয়, তাহলে ডান হাত দ্বারা পাথরের প্রতি ইশারা করবে। তবে ইশারা করে হাত চুমবে না এবং তকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলার মত দুই হাত তুলবে না। এই সময় বলবে, '**বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার।**'

এ সব কিছু পাথরের তা'যীমের উদ্দেশ্যে নয়; বরং উদ্দেশ্য কেবল মহামহিমান্বিত আল্লাহর সন্তোষবিধান এবং প্রিয় রসূল ﷺ এর অনুসরণ। যার ফলে হাজীর পাপক্ষয় হয়।

হাজারে আসওয়াদ চুম্বন দেওয়া হজ্জ বা তওয়াফের কোন অঙ্গ নয়। তাই চুম্বন কোন জরুরী কাজও নয়। বর্কতের লাভে স্পর্শও বিদআত এবং আল্লাহর ডান হাত মনে করাও সঠিক নয় কারণ, এ বিষয়ে হাদীসে গড়া অথবা দুর্বল। *(যয়ীফুল জামে' ২৭৭১, ২৭৭২নং)* সুতরাং তার জন্য ভীড় জমানো অথবা ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি করা মোটেই বৈধ নয়।

অতঃপর কা'বা শরীফকে বাম দিকে করে তওয়াফ শুরু করবে। বিভিন্ন দুআ, যিক্র বা তেলাঅত দ্বারা তওয়াফে বিনয়, একাগ্রতা, শুদ্ধচিত্ততা ও (কা'বার নয় বরং) আল্লাহর তা'যীমের সহিত মনোনিবেশ করবে। অধিক এদিক ওদিক তাকাতাকি করবে না ও কথাবার্তা বলবে না -যদিও তা বৈধ।

তওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোন দুআ নেই। আবার প্রতি চক্করের জন্য এক এক দুআ নির্দিষ্ট করারও কোন ভিত্তি নেই। যেমন, যে দুআ পড়বে তা নিশ্চুপে পড়বে এবং উচ্চরবে পড়ে অপর তওয়াফকারীদের ডিস্টার্ব করবে না।

যখন (হাজারে আসওয়াদের আগের কোণ) রুক্নে ইয়ামানীর বরাবর পৌঁছবে তখন সম্ভব হলে ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করবে এবং বলবে, '**বিসমিল্লাহি অল্লাহ আকবার।**' (হাতটিতে চুম্বন দেবে না আর স্পর্শের সময় অন্য দুআও বলবে না, কারণ এ ক্ষেত্রে দুআর হাদীসটি যয়ীফ। *(যয়ীফুল জামে' ৬১২৭নং)* যদি স্পর্শ সম্ভব না হয় তবে ইশারা করবে না এবং তকবীরও বলবে না। বরং সাধারণভাবে অতিক্রম করে যাবে। অতঃপর এই রুক্নে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলবে,

( )

'রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্য়্যা হাসানাতাঁউ অফিল আ-খিরাতি হাসানাহ, অক্বিনা আযা-বান্না-র।'

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পার্থিব জীবনে কল্যাণ দাও এবং পারলৌকিক জীবনেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

অতঃপর হাজারে আসওয়াদের বরাবর (নীচে কালো দাগের সোজা) এলে এক চক্কর শেষ হবে এবং সেই সাথে শুরু হবে দ্বিতীয় চক্কর। এখানে এসে একবার **'আল্লাহু আকবার'** বলবে এবং হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে না পারলে স্পর্শ করবে। তা সম্ভব না হলে কেবল ডান হাত দ্বারা ইশারা করেই (এবং হাত চুম্বন না করেই) অতিক্রম করবে। যেমন সেখানে (দাগের উপর) থেমে ভিঁড় বাড়ানোও উচিত নয়। খেয়াল করবে যেন হাতীমের ([2]) বাইরে থেকে তওয়াফ হয়। আর এইভাবে সাত চক্কর শেষ করবে।

মক্কা আগমনের পর সর্বপ্রথম এই তওয়াফটির নাম তওয়াফে কুদূম। এই তওয়াফে দুটি কাজ সুন্নত।

১- ইযতিবা, অর্থাৎ চাদরের মাঝখানটাকে ডান বগলের নীচে রাখবে এবং কিনারাটাকে বাম কাঁধের উপর চাপিয়ে দেবে। এতে ডান কাঁধটি বীরদের মত খোলা থাকবে। যাতে ইবাদতস্থলে বলবত্তা ও কর্মণ্যতা প্রকাশ পায়।

অতএব তওয়াফে কুদূম শুরু করার পূর্ব হতে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে ইযতিবা সুন্নত। ইহরাম বাঁধার পর থেকে নিয়ে হজ্জের সর্বশেষ ইহরাম খোলা পর্যন্ত সময় ধরে (এমন কি নামাযের মধ্যেও!) ডান কাঁধটিকে খোলা রাখার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই; যেমন বহু হাজী তা করে থাকে। বরং ঐভাবে নামায শুদ্ধ হয় না।

২- রমল। অর্থাৎ ছোট পদক্ষেপের সহিত শীঘ্র (কুচকাওয়াজী) চলা। কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হয়ে তওয়াফ আফযল। কিন্তু দূরবর্তী হয়ে রম্‌ল করা, নিকটবর্তী হয়ে তওয়াফ করতে গিয়ে ভিঁড়ে তা ত্যাগ করা থেকে উত্তম।

কেবলমাত্র তওয়াফে কুদূম (বা তওয়াফে ওমরাহ) এর প্রথম তিন চক্করে রম্‌ল করা সুন্নত। অন্য কোন তওয়াফ বা চক্করে নয়। যদি প্রথম তিন চক্করে কোন অসুবিধার কারণে রম্‌ল ছুটে যায় এবং চতুর্থ বা তার পরবর্তী চক্করে রমল করার সুযোগ হয়, তবে তা কাযা করবে না। যাতে ঐ চক্করগুলির নির্দিষ্ট গুণ বিনষ্ট না হয়ে যায়। প্রথম তিন চক্করের এক অথবা দুই চক্করে রমলের সুযোগ হলে তাও করে নেবে।

তওয়াফ করাকালে যদি ফরয নামাযের ইকামত হয়ে যায় তবে তওয়াফ ছেড়ে জামাআতে ও নামাযে শামিল হয়ে যাবে এবং নামায পড়ে ঠিক যেখানে ছেড়ে ছিল ঠিক সেখান থেকেই বাকী চক্কর পুরো করবে। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/২২৮)*

চক্কর গণনায় সন্দেহ হলে নিশ্চিতের উপর ভিত্তি করবে। আর নিশ্চিত হবে কমতির

( ) হাতীম কা'বাগৃহের উত্তর-পশ্চিম কোণে ত্যক্ত অংশ; যা গোলাকার দেওয়াল দ্বারা ঘিরা আছে।

উপর। সুতরাং যদি সন্দেহ হয় যে, ছয় চক্কর হল অথবা সাত; তবে ছয় ধরে নেবে। তদনুরূপ সায়ীর চক্করেও করবে।

তওয়াফ শেষ হলে চাদর সিধা করে নেবে। অর্থাৎ দুই কাঁধই ঢেকে নেবে। এরপর আর কোন সময়ে কাঁধ বের করতে হবে না। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীম ([3]) এর নিকট পৌঁছে পড়বে, ( )

'অত্তাখিযূ মিম মাক্বা-মি ইবরা-হীমা মুসাল্লা।'

তারপর এর পশ্চাতে দুই রাকআত তওয়াফের নামায আদায় করবে। ভিঁড়ের কারণে 'মাকাম' থেকে কাছে অথবা পশ্চাতে সম্ভব না হলে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়ে নেবে। এই নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতেহার পর 'কুল ইয়্যা আইয়্যুহাল কা-ফিরূন' ও দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করা সুন্নত।

ঠিক তওয়াফ শেষ হওয়ার পরেই যদি কোন ফরয অথবা সুন্নত নামায পড়ার থাকে ও পড়ে তাহলে তওয়াফের দুই রাকআত আর পড়তে হবে না। *(মুফীদুল আনাম ১/৩০৭)*

তওয়াফ করে ২ রাকআত নামায পড়লে একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান সওয়াব লাভ হয়। *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৫নং)*

প্রকাশ যে, এই নামায লম্বা করে পড়া এবং নামাযের শেষে হাত তুলে মুনাজাত বিধেয় নয়। *(আলমু'তামির অলহাজ্জ---, ইবনে উসাইমীন ৪০পৃঃ)* এ ছাড়া মাকামে ইব্রাহীম স্পর্শ করা, ছুঁয়ে বর্কত নেওয়া বা গায়ে-মাথায় হাত বুলানো ইত্যাদি বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কা'বা শরীফের গেলাফ বা অন্যান্য দেওয়ালাদি স্পর্শ করে তাবার্রুক গ্রহণ, মদীনা শরীফে নববী হুজরা, মিম্বর বা মিহরাব স্পর্শ ও চুম্বন করে তাবার্রুক গ্রহণ, মক্কা ও মদীনা শরীফের মাটি দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ, কা'বা ও মদীনার মসজিদের 'মীযাব' (ছাদ থেকে পানি পড়ার নল) হতে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির পানি গায়ে নিয়ে তাবার্রুক গ্রহণ, মীযাবের নিচে কোন নির্দিষ্ট দুআ পাঠ ইত্যাদিও অবৈধ। *(মাজমূ ফাতাওয়া ২৬/১২১)*

পক্ষান্তরে কেউ চাইলে হাজারে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মধ্যবর্তী দেওয়ালে (মুলতাযামে) বুক, চেহারা, হাত ও বাহু রেখে আল্লাহর নিকট দুআ করতে পারে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ভিক্ষা করতে পারে। তওয়াফে বিদা' বা তার আগে পরে যে কোন সময়ে করতে পারে। দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়েও দুআ করা যায়। *(মানাসিকুল হাজ্জ, ইবনে তাইমিয়্যাহ*

( ) কা'বা শরীফের পূর্ব-উত্তর পার্শ্বে স্থিত গম্বুজাকার কাঁচ-নির্মিত একটি ছোট ঘর, যার মধ্যে পাথরের উপর হযরত ইব্রাহীম ﷺ এর পদচিহ্ন রক্ষিত আছে।

৩৮৬পৃঃ, আলবানী ২৩পৃঃ) এ ছাড়া আর কোথায় দুআ কবুল হবে (যেমন মীযাবের নিচে, যমযমের নিকট ইত্যাদি) তা মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ দলীল সাপেক্ষ।

পায়ে চলে তওয়াফ করাই আসল। তবে যদি বার্ধক্য বা অসুস্থতাজনিত কোন কারণে চলতে সক্ষম না হয় তাহলে কোন বাহনের সাহায্যে তওয়াফ করা সিদ্ধ হবে।

মুসলিম নারীর উচিত, এই তওয়াফ বা বাকী সর্বক্ষণে পর্দা, সম্ভ্রম ও নারীত্বের খেয়াল রাখা। তার সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে আবৃত করে পুরুষদের সামনে আসবে। কোন চিত্তাকর্ষী, মনোহারী ও শব্দব্যঞ্জক পোশাক, অলঙ্কার এবং কোন প্রকার সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। মনোরম পরিচ্ছদ ও আভরণাদি বোরকার ভিতরে গুপ্ত রাখবে। যথাসম্ভব পুরুষদের ভিঁড় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের জন্য অথবা রুকনে ইমানীর স্পর্শ করা জন্য পুরুষদের সহিত পাল্লা দেওয়া উচিত নয়। বরং অগণিত পুরুষের সামনে চেহারা খুলে এবং তাদের সহিত ধস্তাধস্তি করে চুম্বন দেওয়াই অবৈধ। যেহেতু কল্যাণ আনয়নের চেয়ে অকল্যাণ অপসারণ করাই অগ্রগণ্য। ইমাম নওবী (রঃ) বলেন, 'আমাদের আসহাবগণ বলেন, রাত্রি ইত্যাদিতে তওয়াফের স্থান খালি না হলে মহিলাদের জন্য হাজারে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করা মুস্তাহাব নয়। কারণ, (ভিঁড়ের মধ্যে তা করতে গেলে) তাদের নিজের ক্ষতি হয় এবং তাদের কারণেই ক্ষতি হয় পুরুষদেরও।' *(ফাতহুল বারী ৩/৪৭৯, শারহুল মুহায্যাব ৮/৩৪)*

সা'ঈ

অতঃপর তওয়াফ ও নামায শেষে যমযমের পানি পান করবে ও মাথায় নেবে। অতঃপর সম্ভব হলে তকবীর পড়ে হাজারে আসওয়াদ ডান হাত দ্বারা স্পর্শ বা ইশারা করে সাফা পর্বতের দিকে অগ্রসর হবে। পর্বতের নিকট পৌঁছে এই আয়াত শরীফটি পাঠ করবে,

)

(কুঃ ২/১৫৮) (

অতঃপর **'আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহ'** বলে সাফার উপর চড়ে কেবলামুখ হবে এবং কা'বা দেখার চেষ্টা করবে। আল্লাহর তওহীদ বর্ণনা করবে ও তকবীর পড়বে এবং এই দুআ বলবে,

.

. ( )

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহ্য়্যী অয়্যুমীতু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু (লা শারীকা লাহ), আনজাযা ওয়া'দাহ, অনাসারা আবদাহ, অহাযামাল আহযাবা অহদাহ।

অর্থঃ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি সর্বমহান। আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সারা রাজত্ব এবং তাঁরই সকল প্রশংসা। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি এককভাবে শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।

এই সাথে যথাসম্ভব হাত তুলে দুআ (মুনাজাত) করবে। (কিন্তু দুআ শেষে হাত মুখে ফিরাবে না। যেহেতু হাত তুলে দুআর শেষে মুখে মাসাহ করার প্রমাণে কোন সহীহ বা হাসান হাদীস নেই। যেমন তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলার মত হাত তুলে কা'বার প্রতি ইঙ্গিত করা ভুল।)

এইরূপ তকবীর ও দুআ ৩বার পাঠ করবে। অতঃপর সেখান থেকে নেমে মারওয়া পর্বতের প্রতি চলতে শুরু করবে। যখন সবুজ প্রতীকের (লাইটের) নিকট পৌঁছবে তখন পরবর্তী প্রতীক পর্যন্ত যথাসম্ভব দৌড় দেবে বা সবেগে চলবে। কিন্তু মহিলারা সাধারণভাবে চলেই তা অতিক্রম করবে। আশেপাশে কোন বেগানা পুরুষ না থাকলে দৌড় দেবে। অতঃপর সাধারণ গতিতে চলে মারওয়ার নিকট পৌঁছে সা'ঈর প্রথম চক্র শেষ করবে। পর্বতের উপর চড়ে কেবলামুখ হবে এবং সাফায় যেভাবে দুআ আদি পড়েছিল তাই এখানেও পড়বে। (কেবল আয়াতটি পড়বে না।) অতঃপর সেখান হতে নেমে সাফার প্রতি যাত্রা করবে। পূর্বে চক্রের মত এ চক্রেও সাধারণ চলার স্থানে চলবে এবং দৌড়ের স্থানে দৌড়বে। এইভাবে সাফার নিকট পৌঁছে দ্বিতীয় চক্র সমাপ্ত করবে। সাফায় চড়ে আর ঐ আয়াত পড়বে না। কিন্তু ঐ দুআ ও মুনাজাত পূর্বের মতই করবে।

সা'ঈর মাঝে সাধ্যমত যিক্র ও তেলাঅত করবে। প্রকাশ যে, সা'ঈর জনও নির্দিষ্ট কোন

দুআ নেই। তবে এতে .
'রাব্বিগফির অরহাম ইন্নাকা আন্তাল আআযযুল আকরাম' দুআটি বলা যায়। এটি ইবনে মাসঊদ ﷺ ও ইবনে উমার ﷺ পাঠ করতেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

অনুরূপ ৭ বার যাতায়াত করে মারওয়ার নিকট পৌঁছে সা'ঈর সাত চক্র শেষ করবে। তওয়াফে হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্তই এক চক্কর হয়। কিন্তু সা'ঈতে সেরূপ নয়। এতে সাফা থেকে শুরু করে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্র এবং পুনরায় মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত আর এক চক্র হয়। আর এইভাবে ৭ বার যাওয়া ও আসার মাধ্যমে সা'ঈ পূর্ণ হয়।

জানার বিষয় যে, সা'ঈর জন্য পবিত্রতা ও ওযু মুস্তাহাব, (ওয়াজেব নয়)। সুতরাং তওয়াফের পর সা'ঈর পূর্বে বা মাঝে (মহিলাদের) অপবিত্রতা দেখা দিলে অথবা ওযু নষ্ট হয়ে গেলেও সা'ঈ পুরো করে নেওয়া জায়েয হবে।

সা'ঈ সমাপ্তির পর মস্তক মুন্ডন বা চুল খাটো করবে। তবে মুন্ডন করাই আফযল। কিন্তু তামাত্তু হজ্জ করলে চুল ছোট করে নেওয়া ভালো। যাতে কুরবানীর দিন মুন্ডন করতে পারে। অবশ্য হজ্জের জন্য যথেষ্ট সময় থাকলে চুল বের হয়ে যাবে মনে হলে মুন্ডন করে নেবে। পরন্তু মাথায় কোন চুল না থাকলে তা ওয়াজেব নয়। মাথায় ক্ষুর বুলানোও বিধেয় নয়। মহিলারা চুলের ডগা হতে কেবল একটি আঙ্গুলের ডগা বরাবর মত চুল কেটে ফেলবে।

মাথা নেড়া বা চুল কাটার সময় মাথার কিছু অংশ থেকে চুল নেওয়া যথেষ্ট নয়। নেড়া করলে পুরো মাথা করবে, ছাঁটলেও পুরোটা ছাঁটবে। কিছু অংশ চেঁছে কিছু অংশ ছেড়ে রাখা বৈধ নয়। চাঁচতে বা ছাঁটতে নিজের (হাজীর) ডান থেকে শুরু করবে।

এই পর্যন্ত করলে উমরাহ শেষ হয়ে যায় এবং মুহরিম হালাল হয়ে যায় ও সব কিছু (লেবাস, সুগন্ধি, স্ত্রীসঙ্গম ইত্যাদি) তার জন্য বৈধ হয়ে যায়।

কিন্তু যদি কেউ সঙ্গে হাদ্ই (কুরবানী) এনে ক্বিরান হজ্জ করতে চায় তাহলে সে হালাল না হয়ে ইহরামেই থাকবে। তবে যে ব্যক্তি সঙ্গে হাদ্ই না এনে ক্বিরান করতে চায় বা ইফরাদ হজ্জ করতে চায় তার জন্য উমরাহ করে হালাল হয়ে গিয়ে তামাত্তু হজ্জ করাই সুন্নত। সুতরাং যদি সে উমরাহ করে হালাল হয়ে যায় তবে তামাত্তু হজ্জের মত সব কিছু করবে। আর ইহরামেই থেকে গেলে তাওয়াফে ইফাযার পর আর দ্বিতীয় সা'ঈর প্রয়োজন হবে না।

উমরার ইহরাম বাঁধার পর যদি কোন স্ত্রীলোকের ঋতু (হায়েয বা নেফাস) শুরু হয়ে যায়, তবে মক্কা শরীফে প্রবেশের পর পবিত্রা না হওয়া পর্যন্ত তওয়াফ ও সা'ঈ করবে না। পবিত্রা হলে উমরাহ সম্পন্ন করবে। কিন্তু কোন মহিলা যদি আরাফার আগের দিন পর্যন্ত পবিত্রা না

হয় তাহলে অন্যান্য হাজীদের মত সেও ইহরাম বেঁধে মিনা যাত্রা করবে এবং উমরাহ না করতে পেরে সে এক প্রকার ক্বিরান হজ্জ করবে। হাজীরা যেরূপ করে ঠিক তদনুরূপ আরাফায় অবস্থান মুযদালিফায় ও মিনায় রাত্রিবাস, পাথর মারা ও কুরবানী করা, চুল ছোট করা ইত্যাদি কর্ম করবে। এরপর যখন পবিত্রা হবে তখন একবার তওয়াফ ও একবার সায়ী করবে এবং তা তার উমরাহ ও হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে।

প্রকাশ যে, মহিলা ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করে হজ্জ সমাধা করতে পারে।

হজ্জের করণীয়

৮ই যুলহজ্জ

আটই যুলহজ্জ তারবিয়ার দিন (যাদের ইহরাম নেই তারা) নিজ নিজ বাসাতেই (এবং মিনায় থাকলে মিনাতেই) নতুনরূপে গোসল করে দেহে খোশবু লাগিয়ে ও ইহরামের লেবাস পরে হজ্জে প্রবেশ হওয়ার নিয়ত করবে এবং বলবে, '**আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জা। লাব্বাইকাল্লাম্মা লাব্বাইক----।**' নায়েবরা পূর্বের মতই বলবে '**লাব্বাইকা হাজ্জান আন** (ফুলান)' এবং যার নামে হজ্জ করছে 'ফুলান'-এর স্থলে তার নাম নেবে।

তালবিয়া খুব বেশী বেশী করে পাঠ করবে এবং এই তালবিয়া চলবে ১০ তারীখে জামরাহ আকাবাহতে পাথর মারা পর্যন্ত।

অতঃপর মক্কা শরীফ থেকে মিনার প্রতি যাত্রা করবে। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব এশা এবং ফজরের নামায (মাগরিব ও ফজর ছাড়া) কসর করে স্ব-স্ব সময়ে আদায় করবে।

৯ই যুলহজ্জ

৯ই যুলহজ্জের যখন সূর্যোদয় হবে তখন তকবীর ও তালবিয়ার সহিত আরাফার প্রতি যাত্রা করবে। সম্ভব হলে নামেরাতে (আরাফার পূর্বে একটি স্থানের নাম যেখানে মসজিদে নামেরাহ অবস্থিত সেখানে) অবস্থান করবে। অতঃপর সূর্য ঢলে গেলে বাতনে উরানায় প্রবেশ করবে। অতঃপর এক আযান ও দুই একামতে যোহর ও আসরের নামায কসর করে আদায় করবে। এখানে ইমাম খুৎবা দেবেন। অতঃপর আরাফাতে প্রবেশ করে অকুফ (অবস্থান) করবে। অত্যাধিক ভিঁড়ের কারণে নামেরাহ বা উরানায় অবস্থান সম্ভব না হলে সরাসরি আরাফায় গিয়ে অবস্থান দূষণীয় নয়।

আরাফার ময়দানে প্রবেশ করার পর বিভিন্ন ফলক-সঙ্কেত লক্ষ্য করে তার সীমার ভিতরে আছে কিনা তা জেনে সুনিশ্চিত হবে। কারণ সঠিকভাবে আরাফায় অবস্থান ব্যতীত হজ্জই হবে না। আরাফাতের ময়দানে যে কোন স্থানে অবস্থান করা যাবে। বাতনে উরানাহ আরাফাতের মধ্যে নয়। মসজিদে নামেরার কেবলার দিকে প্রায় অর্ধেকাংশ আরাফার মধ্যে গণ্য নয়। অতএব যারা মসজিদে অবস্থান করবে তাদেরকে কেবলার দিক ছেড়ে পশ্চাৎ দিকে অবস্থান করা উচিত। অবশ্য চারি পাশে আরাফাতের সীমা নির্দেশক ফলক স্থাপিত আছে। শিক্ষিতদের পক্ষে তা জানা খুবই সহজ।

সম্ভব হলে জাবালে আরাফাহ (লোকমুখে প্রচলিত ঃ জাবালে রাহমাহ; আরাফাতের এক পর্বত)কে সম্মুখে রেখে কেবলামুখ হয়ে অবস্থান করবে এবং সম্ভব না হলে কেবল কেবলামুখী হয়ে আরাফার সীমার ভিতরে যে কোন স্থানে অবস্থান করবে। জাবালে আরাফাতে চড়া বা তার উপর অবস্থান করা কোন বিধেয় কর্ম নয়। ঐ পর্বতে চড়লে কোন পৃথক মর্যাদা বা মাহাত্ম্যও নেই। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/২৬৩)*

এই স্থানে হাজীর উচিত যে, একাগ্রচিত্তে ও গভীর ভক্তি ও একনিষ্ঠ ভাবাবেগের সহিত তেলাঅত, যিক্র, দুআ ও ইস্তেগফার করবে। মহান আল্লাহর সমীপে অনুনয় বিনয় করবে। নিজের শক্তিহীনতা ও মুখাপেক্ষিতা তাঁর নিকট প্রকাশ করবে। 'কিছু প্রয়োজন নেই' বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে না এবং নিতান্ত আগ্রহের সাথে তাঁর নিকট ক্ষমা, মুক্তি ও সাহায্য চাইবে। নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করবে।

এই মহান দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হচ্ছে,

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।'

এই দুআ বেশী বেশী করে পাঠ করবে।

এ ছাড়া সহীহ হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য যিক্র, দুআ ও অযীফাহ এবং তালবিয়াহ পাঠ করবে। তালবিয়ার সাথে '**ইন্নামাল খাইরু খাইরুল আ-খিরাহ**' অতিরিক্ত করাও বৈধ। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৩০পৃঃ)*

এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ দিনে এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় অবশ্যই হারানো উচিত নয়, দুই হাত তুলে সকাতরে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও সুখ তাঁর নিকট প্রার্থনা করে নেবে। কোন রকমের সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত মনে নয়; বরং আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেনই- এই মন ও বিশ্বাস রেখে মিনতি সহকারে আকুল আবেদন পেশ করবে পরম দয়ালুর দরবারে। (যে

বিষয়ে প্রার্থনা করবে সে বিষয়ে নববী দুআ অজানা থাকলে নিজের ভাষাতেই প্রার্থনা করবে। তবে নববী দুআই হল আফযল। তাঁর অসীম করুণা ও বিরাট ক্ষমার আশা করবে। তাঁর ভয়ঙ্কর আযাব ও গযবকে ভয় করবে। নিজ আত্মার হিসাব নেবে এবং শুদ্ধচিত্তে তাঁর নিকট অনুশোচনার সহিত সকল পাপ কাজ থেকে তওবা করবে।

প্রকাশ যে, এই দিনে এই স্থানে (আরাফার) রোযা রাখা উচিত নয়।

এটা এক মহাদিন, মহা সম্মেলন। যে দিনে মহান আল্লাহ বান্দাকে বহু কিছু দান করে থাকেন। যে দিনের জন-সমাবেশ নিয়ে তিনি ফিরিশ্তাদের নিকট গর্ব করেন। জাহান্নাম হতে বহু মানুষকে মুক্তিদান করেন। এই দিনে শয়তান সর্বাধিক লাঞ্ছিত, অপদস্থ, হীনতাগ্রস্ত ও তুচ্ছ হয়; যেমন হয়েছিল বদর যুদ্ধের দিন।

এই ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। (এর পূর্বে আরাফাতের সীমানা হতে বের হওয়া বৈধ নয়।) সূর্য অস্ত গেলে ধীর ও শান্তভাবে মুযদালিফার প্রতি রওনা হবে। চলার পথে কোন মানুষকে কষ্ট দেবে না, ভিঁড়ে ধাক্কাধাক্কিও করবে না। বাজে কথা, বিতর্ক ও কাজ থেকে দূরে থাকবে। রাস্তা খালি পেলে শীঘ্র চলবে। বেশী বেশী তালবিয়াহ পাঠ করবে। মুযদালিফায় পৌঁছনর পর মাগরিব ও এশার নামায জমা ও কসর করে আদায় করবে। কিন্তু রাস্তার মধ্যে যদি এশার সময় হয়ে পার হবার আশঙ্কা থাকে, তবে যে কোন স্থানে পড়ে নেবে। এর মাঝে বা পরে কোন নফল পড়বে না। (বিত্র পড়তে পারে।) নামায শেষে অন্য কোন কাজ, গল্প বা অযীফায় রাত্রি না জেগে সকাল সকাল ঘুমিয়ে বিশ্রাম নেবে। যাতে কুরবানীর দিন বিভিন্ন কর্তব্য আদায়ে ত্রুটি ও আলস্য না আসে। অতঃপর প্রথম সময়ে (আওয়াল ওয়াক্তে) ফজরের নামায আদায় করে মাশআরুল হারাম (পর্বতের) নিকট অবস্থান করে কেবলামুখ হয়ে আল্লাহর যিক্র করবে এবং হাত তুলে দুআ করবে। তবে ঐ পর্বতের নিকটবর্তী হওয়া ওয়াজেব নয়। যেমন ওর উপরে চড়াও কোন বিধেয় কর্ম নয়।

উজ্জ্বল সকাল হয়ে এলে সূর্যোদয়ের পূর্বে সেখান হতে মিনার প্রতি যাত্রা করবে। এই সময় অধিক অধিক তালবিয়াহ পড়তে হবে। ওয়াদি মুহাসসির পৌঁছে একটু শীঘ্র চলবে।

বৃদ্ধ, নারী অথবা শিশু প্রভৃতি দুর্বল শ্রেণীর মানুষ ও তাদের সবল সঙ্গী ও অভিভাবকদের জন্য রাত্রে চন্দ্রাস্তের পর মিনা যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। *(বুখারী ১৫৯৪, মুসলিম ১২৯৩নং)*

১০ই যুলহজ্জ

মিনা পৌঁছে জামরাহ আকাবাহ (যাকে বড় জামরাহ বলা হয় এবং যা মসজিদে খাইফ থেকে তৃতীয় ও শেষ এবং মক্কা থেকে প্রথম পাথর মারার স্থান) পৌঁছে তালবিয়াহ বন্ধ করবে

ও পাথর মারবে। তবে সবল ও সক্ষম ব্যক্তিরা সূর্যোদয়ের পরই পাথর মারবে।

সাতটি পাথর দ্বারা রম্‌ই জিমার করবে। পাথরগুলি সাইজে ছোলা থেকে একটু বৃহদাকার হবে। এই পাথর যে কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করা যাবে। মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করা জরুরী নয়। তবে মিনায় পৌঁছে পাথর না পাওয়ার বা সংগ্রহ করতে সময় না পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুযদালিফা থেকে কুড়িয়ে রাখবে। সংগ্রহের পর পাথরগুলিকে ধৌত করতেও হবে না। প্রতি নিক্ষেপের সহিত তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে। এই স্থানে নির্দিষ্ট কোন পঠনীয় দুআ নেই।

এই সময় হাজীর উচিত, আল্লাহর জন্য তা'যীম ও বিনয় প্রকাশ করা। শক্তি ব্যবহার বা ধাক্কাধাক্কি করে অপর হাজীকে কষ্ট দিয়ে শান্তি ভঙ্গ না করা। পাথর মারার সময় নিশ্চিত হওয়া যে, তার পাথর ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে পড়ছে কি না? স্তম্ভে লেগে হওযের বাইরে যেন চলে না আসে। প্রকাশ যে, ব্যবহৃত পাথর কুড়িয়ে দ্বিতীয় বার মারা যাবে না।

কা'বা শরীফকে বামে ও মিনাকে ডাইনে করে বাতনে ওয়াদীতে দন্ডায়মান হয়ে এই পাথর মারা মুস্তাহাব। ভিঁড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে অন্যান্য দিক হতে সিদ্ধ হয়ে যাবে।

উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরবানীর দিন সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্য ঢলা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জামরাহ আকাবায় পাথর মারা সুন্নত। অবশ্য ঐ দিনে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মারলেও সিদ্ধ সময়ে মারা হয়। কিন্তু যদি কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে মারতে না পারে তাহলে (পরে আর পাথর না মেরে) পরদিন সূর্য ঢলার পর (কাযা) মেরে নেবে। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/২৭৫)*

পাথর মারার পর তামাত্তু বা ক্বিরান হজ্জ করলে কুরবানীগাহে এসে মিনার অন্যান্য জায়গা বা মক্কার যে কোন জায়গাতেও কুরবানী করতে পারে। যদি ঐ দিনে সম্ভব না হয়, তাহলে পরবর্তী ১৩ তারীখ পর্যন্ত যে কোন দিন করে নেবে। কুরবানী নিজ হাতে করা অসুবিধা বুঝলে কুরবানী-বিষয়ক নির্দিষ্ট সংস্থা বা ব্যাংকে কুরবানীর মূল্য পূর্বেই জমা দেবে।

তারপর কেশ মুন্ডন বা কর্তন করবে, তবে মুন্ডনই উত্তম। মূল্য জমা দিয়ে থাকলে পাথর মেরেই কেশ মুন্ডন অথবা কর্তন করতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুন্ডন অথবা কর্তন পুরো মস্তক হতেই হতে হবে। মহিলা প্রত্যেক বেণী হতে এক আঙ্গুলের অগ্র (এক গিঁড়ে) বরাবর কাটবে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহিলাদের জন্য মাথার উপরে খোঁপা বা ঝুটি বাঁধা বৈধ নয়। মাথার পিছন দিকে খোঁপা বাঁধা থেকে বেণী বা চুটি গেঁথে মাথা বাঁধা ভালো এবং হজ্জ বা উমরার সময় ঐ এক গিঁড়ে পরিমাণ ছাড়া অন্য সময় চুল ছোট করা বা কাটিং করা বৈধ নয়।)

এতটুকু করার পর মুহরিমের জন্য প্রথম হালাল লাভ হয়। তাই এবারে সে নিজের সাধারণ পোশাক পরতে পারে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে, নখ কাটতে পারে ইত্যাদি। বরং স্ত্রী

ব্যতীত সর্বপ্রকার বস্তু ও কর্ম যা এহরামে অবিধেয় ছিল বৈধ হয়ে যায়। কুরবানী করতে না পারলেও পাথর মেরে কেশ মুন্ডন বা কর্তন করার পর, অথবা পাথর মেরে তওয়াফ ও সা’ঈ করার পর, অথবা তওয়াফ, সা’ঈ ও কেশ মুন্ডনের পর এই হালাল লাভ হয়। *(আত্তাহক্বীক্ব অলঈযাহ ৫৬পৃঃ)* মতান্তরে কেবল পাথর মারার পরই প্রথম হালাল লাভ হয়। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৩৩পৃঃ)*

অতঃপর খোশবু ব্যবহার করে কাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে হজ্জের তওয়াফ (তওয়াফে ইফাযাহ বা যিয়ারাহ) করবে; যা হজ্জের এক রুক্ন এবং যা না করলে হজ্জই হয় না।

যার প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ﴾

“অতঃপর তারা যেন দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে।” *(কুঃ ২২/২৯)*

ঐ দিনে সম্ভব না হলে রাত্রে অথবা তশরীকের যে কোন দিনে ঐ তওয়াফ করতে পারে। অতঃপর তওয়াফের পর মাকামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে দুই রাকআত নামায আদায় করে সাফা ও মারওয়ার সা’ঈ করবে। যদি তামাত্তু হজ্জ হয় তাহলে এটা তার হজ্জের সা’ঈ হবে এবং পূর্বেকার সা’ঈ ওমরার। ক্বিরান অথবা ইফরাদ হজ্জে তওয়াফে কুদূমের সহিত সা’ঈ না করে থাকলে সা’ঈ করবে।

এই তওয়াফ (ও সা’ঈর) পর মুহরিম সম্পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যাবে। তখন স্ত্রী-সঙ্গমও তার জন্য বৈধ হবে।

কুরবানীর দিন করণীয় আমলগুলিকে নবী ﷺ-এর মত যথাক্রমে করাটাই সুন্নত। অতএব সর্বপ্রথম পাথর মারবে, অতঃপর কুরবানী, অতঃপর মস্তক মুন্ডন বা কেশ কর্তন, তারপর তওয়াফ ও সা’ঈ। অবশ্য এর ব্যতিক্রম করলেও কোন দোষ নেই। তবে পাথর মারার কাজ সর্বাগ্রে করা উচিত। কারণ, তা মিনার এক অভিবাদন। *(মুগনী ৫/২৮৮)*

যমযমের পানি পান করা এবং তারপর কোন ফলপ্রসূ দুআ করা ও তা মাথায় ঢালা হাজীর জন্য মুস্তাহাব। যেহেতু যমযমের পানি এক প্রকার আহার ও মহৌষধ এবং তা যে উদ্দেশ্যে পান করা যায় আল্লাহ তা পূরণ করেন।

প্রকাশ যে, যমযমের পানি কেবলামুখ হয়ে পান করা এবং তারপর ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফেআ-----’ দুআ পাঠ করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি যয়ীফ। *(ইরওয়াউল গালীল ৪/৩২৫, ৩৩২-৩৩৩)* যেমন ঐ পানিতে গোসল বিদআত। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৫৩পৃঃ)*

১১ ও ১২ই তারীখ

এরপর হাজী পুনরায় মিনার প্রত্যাবর্তন করবে এবং এগারো ও বারো তারীখের (অধিকাংশ) রাত্রি যাপন করবে। যা হজ্জের এক নিদর্শন বিশেষ, আর তা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। কারণ, রসূল করীম ﷺ পানি পরিবেশক ও পশুরক্ষক দলকে মিনায় রাত্রি যাপন না করতে অনুমতি দিয়েছেন। এই 'অনুমতি' শব্দটি ইঙ্গিত বহন করে যে, তার বিপরীত (রাত্রি যাপন করাটা) অবশ্য-কর্তব্য। অনুরূপভাবে যাদের অন্যান্য কোন ওযর ও অসুবিধা থাকবে তাদের জন্যও মিনা ছাড়া যথাস্থানে রাত্রি যাপনে অনুমতি হবে।

এই দুই দিনে তিন জামরাতেই পাথর মারাও ওয়াজেব। এর সময় শুরু হয় সূর্য ঢলার পর থেকে। পাথর মারার জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়াটাই আফযল। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/১০৩)* প্রথম জামরাহ (যা মসজিদে খাইফ থেকে নিকটতম ও মক্কা থেকে তৃতীয় বা দূরতম)তে পরস্পর সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রতি নিক্ষেপের সহিত 'আল্লাহু আকবার' বলবে। অতঃপর একটু সরে গিয়ে জামরাকে বামে করে কেবলামুখ হয়ে দুই হাত তুলে বেশী বেশী করে অনুনয়-বিনয় সহকারে দুআ করা সুন্নত।

অতঃপর মধ্যম জামরায় অনুরূপভাবে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর একটু অগ্রসর হয়ে এই জামরাকে ডাইনে করে পূর্বের ন্যায় কিবলামুখে দুআ করা সুন্নত। অবশেষে তৃতীয় বা শেষ (আকাবাহ) জামরায় অনুরূপ সাতটি পাথর মারবে। আর এর নিকট (দুআর জন্য) না দাঁড়িয়ে যথাস্থানে প্রস্থান করবে।

দ্বিতীয় দিনে (১২ তারীখে)ও অনুরূপ করবে। এরপর তাড়াতাড়ি থাকলে পাথর মারার পর পরই সফর করতে পারে; এবং তাতে কোন দোষ নেই। তবে সূর্যাস্তের আগে আগেই তাকে মিনা ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য মিনা ত্যাগকালে রোড জাম বা অন্যান্য কারণে মিনার মাঝে পথেই সূর্যাস্ত হলে মিনায় থাকা অবধারিত হবে না। কারণ, পূর্বেই সে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিয়ে চলতে শুরু করেছে। নচেৎ সূর্য ডুবে গেলে ঐ রাত্রি যাপন করে পরের দিন (১৩ই যুল হজ্জ) সূর্য ঢলার পর পূর্বের ন্যায় পাথর নিক্ষেপ করে দেশে (বা মক্কায়) ফিরে যাবে। আর এটাই সুন্নত, আফযল ও সওয়াবের দিক দিয়েও বড়। ঐ দিনে পাথর মারলে তা কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর (জ্যোতি) হবে। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫১৫নং)*

কিন্তু ১২ তারীখের দুপুরের পূর্বে পাথর নিক্ষেপের জন্য কাউকে প্রতিনিধি করে দিয়ে সফর করা বৈধ নয়, যেমন সূর্য ঢলার পূর্বে পাথর মেরে থাকলে তা যথেষ্ট নয়। এতে ফিদ্য়্যাহ লাগবে।

কোন ওযরের ক্ষেত্রে ১১ তারীখের বা ১১ ও ১২ তারীখের রম্‌ইকে ১৩ তারীখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া চলে। কারণ তাশরীকের দিনগুলির প্রত্যেকটাই রম্‌ইর সময়। অতএব (সামর্থ্য থাকতে) প্রতিনিধি করার চেয়ে এরূপ করাটাই উত্তম। যেহেতু রসূল ﷺ উঁট রক্ষকদলকে কুরবানীর দিন রম্‌ই করে তার পরবর্তী দুই রম্‌ইকে একত্রিত করে দু'দিনের মধ্যে কোন এক দিনে রম্‌ই করার অনুমতি দিয়েছিলেন। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলাবানী ৪০পৃঃ)*

অতএব এই পরিস্থিতিতে প্রতিনিধি করা জায়েয থাকলে নিশ্চয় তিনি ﷺ তাদেরকে তার নির্দেশ দিতেন। কারণ, তা সহজ ছিল। পক্ষান্তরে যারা রম্‌ই করতেই অক্ষম; যেমন, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী প্রভৃতি) তাদের জন্য কাউকে উকিল করা বৈধ। এক্ষেত্রে উকিল প্রত্যেক জামরায় প্রথমে নিজের সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে, অতঃপর মোয়াক্কেলের তরফ তেকে সাতটি নিক্ষেপ করবে। কিন্তু উকিলকে বর্তমান হজ্জের হাজী অবশ্যই হতে হবে।

সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এই রম্‌ই করে নেওয়া উত্তম। অবশ্য কিছু আহলে ইল্‌ম তার পরে করাও বৈধ বলেছেন। আর তাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, রসূল ﷺ রম্‌ই শুরু হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করেছেন; কিন্তু শেষ হওয়ার সময় নির্ধারিত করেন নি।

উপরন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, 'একজন নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি সন্ধ্যাবেলায় পাথর মেরেছি?' তিনি বললেন, "মার, কোন ক্ষতি নেই।" *(বুখারী ১৬৪৮-নং)*

আর আরবীতে মাসা- (সন্ধ্যাবেলা) বলে সূর্য ঢলার পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্তের পরেও রাত্রি পর্যন্ত সময়কে। কিন্তু নবী ﷺ জিজ্ঞাসাকারীর নিকট এ বিষয়ে কোন বিবরণও জানতে চাননি যে, সে সূর্যাস্তের পূর্বে অথবা পরে রম্‌ই করেছে। যাতে সাধারণভাবে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, রাত্রেও রম্‌ই করা বৈধ। ইমাম নওবী 'শরহে মুহায্‌যাব'এ বলেন, 'রাত্রে রম্‌ই করার ব্যাপারে দু'টি মত আছে। সঠিক মত বৈধতার। কারণ, উঁট রক্ষকদেরকে রাত্রিকালে রম্‌ই করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।'

পক্ষান্তরে এই অভিমতই ইসলামের সরলতা ও অনায়াস-সিদ্ধতার অনুকূল। বিশেষ করে এই যুগে হাজীদের ক্রমশঃ সংখ্যাধিক্যে যে কষ্ট ও অসুবিধা হয় এবং অতি ভিঁড়ের চাপে যে কিছু মানুষ আহত এবং নিহতও হয়, তা বলাই বাহুল্য। আর সূর্য ঢলার পর থেকে অস্ত পর্যন্ত সময় এই বিরাট সংখ্যক হাজীদের রম্‌ই করার জন্য যথেষ্ট নয়। অবশ্য ভিঁড় হওয়াই এই অভিমতের সঠিকতার কারণ নয়। কারণ, হাজীদের জন্য ওয়াজেব, ইসলামী আদবের অনুগমন করা এবং আত্মরক্ষার সাথে সাথে অপর হাজীদের জানেরও হিফাযত করা। যা পালন করলে অবশ্যই ভিঁড়ের চাপে প্রাণহানি ঘটে না। কিন্তু পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতেই ওযরওয়ালা অক্ষমদের জন্য রাত্রে রম্‌ই করার বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। অতএব

পশুরক্ষক, পানি পরিবেশক, বৃদ্ধ, দুর্বল, শিশু ও মহিলাদের জন্য রাত্রে পাথর নিক্ষেপ বৈধ ও সিদ্ধ হবে। কারণ, সাধারণতঃ তখন ভিঁড় থাকে না। *(আলমাজমু' ৮/২৪০, আযওয়াউল বায়ান ৫/২৮৩, সিফাতুল হাজ্জ, ইবনে উসাইমীন ৬২পৃঃ)*

হাজীর স্মরণে রাখা উচিত যে, রম্ই জিমার এক ইবাদত যা রসূল ﷺ এর অনুকরণ করে আল্লাহর যিক্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যার জন্য প্রত্যেকেই প্রতি নিক্ষেপে 'আল্লাহু আকবার' বলে থাকে। নবী ﷺ বলেন, "পাথর নিক্ষেপ ও সাফা মারওয়ার সা'ঈর বিধান আল্লাহর যিক্র প্রতিষ্ঠার জন্যই করা হয়েছে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)*

অতএব এই পবিত্র স্থানসমূহে যিক্র থেকে বিস্মৃতি ও গাফলতি আদৌ উচিত নয়। বরং তকবীর ও দুআর একান্ত খেয়াল রাখা উচিত। যেমন এই সকল স্থানে অপরকে ক্লেশদান, আপোসে বাজে কথাবার্তা, মহিলাদের প্রতি অবৈধ দৃষ্টিপাত ইত্যাদিও অধিকরূপে বৈধ নয়।

পাথর নিক্ষেপের সময় মাথায় ও কোমরে কাপড় বেঁধে জামার আস্তীন গুটিয়ে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখিয়ে লোকের ভিঁড় চিরা উচিত নয়। তদনুরূপ পাথর মারার সময় এ বিশ্বাস ও ধারণা রাখা উচিত নয় যে, তা শয়তানকে মারছে। *(আলমিনহাজ ফী ইয়াওমিয়্যাতিল হাজ্জ ২৫পৃঃ, ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৩৬)* যেমন, সাফা-মারওয়া সা'ঈ করা কালীন এ ধারণা রাখা উচিত নয় যে, সে পানি খুঁজছে অথবা কোন লোক খুঁজছে। বরং কর্মের হেতু ছাড়া এ সবের মূলে রয়েছে আল্লাহর যিক্র ও নবী ﷺ এর অনুকরণ। অনুরূপভাবে অতিরঞ্জন করে বড় পাথর, ছাতা, জুতা ইত্যাদি নিক্ষেপ বৈধ নয়।

মক্কা মুকার্রামার আদব ও বিদায়ী তওয়াফ

এ নিরাপদ নগরীতে অবস্থানকালে হাজীকে (মুসলিমকে) বিশেষরূপে সতর্কতা, সাবধানতা ও সংযমশীলতা অবলম্বন করা উচিত। যাতে তার দ্বারা কোন প্রকারের পাপ সংঘটিত না হয়ে যায়। যেহেতু এই পবিত্র হারামে সংঘটিত পাপের শাস্তি বৃহত্তর। আল্লাহ পাক বলেন,

( )

"এবং যে তাতে (মসজিদে হারামে) সীমালংঘন করে পাপ কার্য করতে ইচ্ছা করে তাকে আমি মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব।" *(কুঃ ২২/২৫)*

অতএব সেখানে পাপের ইচ্ছা করলে যদি মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হয়, তাহলে পাপ-ইচ্ছা কাজে পরিণত করলে কি শাস্তি হবে তা অনুমেয়। আবার সেখানে কুফ্র ও শির্ক করলে তার ভোগ্য শাস্তির কথা বলাই বাহুল্য।

যেমন হাজীর উচিত, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে হারামে আদায় করা। কারণ, এখানে ১টি নামায ১ লক্ষ নামায অপেক্ষা উত্তম। যেমন তার উচিত, বেশী বেশী তওয়াফ করা। তবে হজ্জ-উমরাহ ছাড়া কেবল সা'ঈ করা বিধিসম্মত নয়।

পারতপক্ষে কোন নামাযীর সামনে দিকে অতিক্রম করবে না। যেহেতু সব মসজিদেই সুতরা জরুরী। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৭পৃঃ)*

মক্কায় অবস্থান কালে হাতে সময় দেখে তানঈম (মসজিদে আয়েশা) বা জিয়িররানাহ ইত্যাদির মীকাতে বের হয়ে বার বার উমরাহ করার ভিত্তি সুন্নায় নেই।

হজ্জের সমস্ত কাজ শেষ করে যখন হাজী নিজের বাড়ি ফিরতে চাইবে তখন তার উপর তওয়াফে বিদা' (বিদায়ী তওয়াফ) ওয়াজেব হবে। যে ব্যক্তি তওয়াফে ইফাযাহ বাকী রেখে মিনা থেকে সফরের নিয়তে মক্কা শরীফ যাত্রা করবে এবং তওয়াফে ইফাযাহ করে দেশে ফিরতে চাইবে, তার জন্য ঐ একটা তওয়াফই যথেষ্ট হবে। আর ভিন্নভাবে তওয়াফে বিদা' করতে হবে না। ছোট বড়র মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। অতএব নিয়ত থাকবে তওয়াফে ইফাযার। কারণ, তা রুক্ন। এটা সিদ্ধ হবে এই জন্য যে, আদেশ হচ্ছে, হাজীর সর্বশেষ বিদায়-স্থল হবে কা'বাগৃহ, আর তওয়াফে ইফাযার পরই সফর করলে তার ঐ আদেশ পালন হয়ে যায়। তাছাড়া যেহেতু একই প্রকারের দু'টি ইবাদত একই সময়ে উপস্থিত হয়, তাই একটি অপর থেকে যথেষ্ট করবে।

(পূর্বে তওয়াফে ইফাযাহ করে থাকলে) ঋতুমতী মহিলাদের ক্ষেত্রে তওয়াফে বিদা' নেই। সফরের সময় পবিত্রা হলে তওয়াফ করবে নচেৎ সঙ্গীদের সহিত সফর করবে।

এই বিদায় কালীন তওয়াফের পর আর কোন কাজের খাতিরে মক্কা শরীফে অবস্থান করা উচিত নয়। বরং সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা থেকে বিদায় হবে। মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করে **'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ অসাল্লিম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফায্‌লিক'** দুআ পাঠ করবে। বের হবার সময় কা'বার দিকে সম্মুখ করে উল্টা পায়ে বের হবে না। চলার সময় পিছন ফিরে কা'বার দিকে তাকাতে তাকাতে, অথবা চলতে চলতে থেমে কা'বার প্রতি বিয়োগব্যথা প্রকাশ করা শরীয়ত-সম্মত নয়। *(মানসাক, ইবনে তাইমিয়্যাহ ৩৮-৭পৃঃ)*

দেশে ফিরার সময় সঙ্গে যমযমের পানি বহন করে নিয়ে গিয়ে রোগীদের পান করানো, মাথায় ঢালা এবং বর্কত ও আরোগ্যের আশা রাখা বিধিসম্মত। *(তিরমিযী ৯৬৩নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৮৩নং)*

❁❁❁❁❁❁❁❁❁

মসজিদে নববীর যিয়ারত

হজ্জের পূর্বে অথবা পরে যে কোন সময়ে মদীনা শরীফের মসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নত। যেহেতু ঐ মসজিদের বড় মাহাত্ম্য ও ফযীলত রয়েছে। এখানে এক ওয়াক্ত নামায পড়লে এক হাজার ওয়াক্তের চেয়ে বেশী নামাযের সওয়াব লাভ হয়। যেমন, কা'বার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়লে এক লক্ষ ওয়াক্তের চেয়ে বেশী নামাযের সওয়াব লাভ হয়।

মদীনার মসজিদ যিয়ারতের জন্য ইহরাম পরা বিধিসম্মত নয়। যেমন সফরকালে কেবল নবীজীর কবর যিয়ারতের নিয়ত করা বৈধ নয়।

যিয়ারতকারী যখন মসজিদে পৌঁছবে তখন তার ডান পা আগে বাড়িয়ে *'বিসমিল্লাহি অস্‌সালাতু অসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ্‌, আঊযু বিল্লাহিল আযীম, অবিঅজহিহিল কারীম, অসুলত্বানিহিল কাদীম, মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।* অথবা *'আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিক'* এই দুআ বলে প্রবেশ করবে। যেমন, অন্যান্য সকল মসজিদ প্রবেশের সময় এই দুআই পড়া হয়। কারণ, মসজিদে নববী প্রবেশের সময় কোন নির্দিষ্ট দুআ বা যিক্‌র নেই।

অতঃপর 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' দুই রাক্‌আত নামায আদায় করবে এবং তাতে পছন্দমত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও শান্তি প্রার্থনা করবে। এই নামায রওযায় পড়লে আরো উত্তম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার গৃহ ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের রওযাহ (বাগিচা) সমূহের এক রওযাহ (বাগিচা)।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৫৫৮৬, ৫৫৮৭নং)*

উল্লেখ্য যে, তাঁর গৃহ এখন তাঁর সমাধিক্ষেত্র। যার উপর সবুজ গম্বুজ নির্মিত আছে। যা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হুজরা ছিল। এ সমাধিক্ষেত্রকে রওযাহ বলা হয় না। বরং এই হুজরার পশ্চিম পার্শ্বে নববী মিম্বর পর্যন্ত সাদা রঙের গালিচা বিছানো স্থানকে রওযাহ বলা হয়।

অতঃপর নামায আদায়ের পর নবী ﷺ এবং তাঁর দুই সাথী আবূবকর ﷺ ও উমার ﷺ এর কবর যিয়ারত করবে। মসজিদের ভিতর (পশ্চিম) থেকে পূর্ব গেটে বের হতে বাম দিকে সর্বপ্রথম কবরে নববী পড়ে। যার ঠিক সোজাসোজি করে রেলিং এর দেওয়ালে একটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র বা গোলাকার ফাঁক আছে। ঐ ফাঁকের সম্মুখে আদব ও শ্রদ্ধার সহিত (কোন রকমভাবে না ঝুঁকে বা তাহরিমার মত হাত না বেঁধে দন্ডায়মান হবে। কথাবার্তা বললে নিম্নস্বরে বলবে। অতঃপর তাঁর উপর সালাম পাঠ করবে; বলবে, *'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।'* তিনি এই সালামের উত্তর দিয়ে

থাকেন। অবশ্য তা ইহজগৎ থেকে কেউই শুনতে ও অনুভব করতে পারে না।

অতঃপর তাঁর উপর দরূদ পাঠ করবে এবং তাঁর জন্য দুআ করবে। তারপর একটু পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পরবর্তী ছিদ্রের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর ﷺ এর উপর সালাম পড়বে। তাঁদের জন্য দুআ করবে এবং আল্লাহর নিকট তাঁর সন্তোষ প্রার্থনা করে বলবে 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।' হুজরার নিকট বেশী লম্বা সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে না এবং শোরগোল করবে না ও জোরে কথাবার্তাও বলবে না।

কোন কবরের নিকট কবরবাসীর কাছে নিজের জন্য কিছু চাইবে না; কারণ, তা শির্ক। কিছু চাইতে হলে আল্লাহরই নিকট চাইবে। অনেকে বলেন, কেবলামুখী হয়ে দুআ করবে। আল্লাহর রসূলের শাফাআতও তাঁর নিকট নয়, আল্লাহরই নিকট চাইবে।

হুজরার তওয়াফ করা, স্পর্শ করে গায়ে মাখা বা চুম্বন করা, মিহরাব বা মিম্বর স্পর্শ করা বা চুম্বন করার অনুমতি ইসলামে নেই। মিহরাবে নববীতে নামায পড়ারও কোন কথা বা ফযীলত শরীয়তে নেই। মসজিদ থেকে উল্টা পায়ে বের হওয়াও শরীয়ত-সম্মত নয়।

প্রকাশ থাকে যে, কবর যিয়ারত কেবল পুরুষরাই করতে পারে মহিলারা দূরে থেকেই বা যে কোন স্থান থেকেই সালাম ও দরূদ পাঠ করবে। অবশ্য মসজিদে নামায পড়লে পুরুষের সমান সওয়াবের অধিকারিণী হবে।

মদীনার যিয়ারতকালে সম্ভব হলে পাঁচ ওয়াক্তেরই নামায মসজিদে নববীতে আদায় করবে। (চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়তে হয় কথাটি ভিত্তিহীন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসটি মুনকার।) *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১/ ৫৪০)* যিক্র দুআ ও নফল নামায বেশী বেশী করে পড়বে। সম্ভব হলে রওযাতে নফল নামায অধিক পড়বে। তবে ফরয নামাযের সময় রওযাহ ছেড়ে প্রথম কাতারে ও ডাইনে শামিল হবে। যেহেতু প্রথম কাতারে ও ডাইনে নামায পড়ার ফযীলত আরো বেশী।

স্মরণে রাখার বিষয় যে, কবরে নববীর যিয়ারত ওয়াজেব নয়। হজ্জের কোন অঙ্গ বা শর্তও নয়। বরং তা নিকটবর্তী মানুষ ও মসজিদে নববীর যিয়ারতকারীর জন্য মুস্তাহাব। পরন্তু কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা দূরবর্তীদের জন্য বৈধ নয়। তবে পবিত্র মসজিদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নত। অতঃপর মসজিদে পৌঁছে গেলে কবরে নববী ও দুই সাহাবীর কবর যিয়ারত মুস্তাহাব। সুতরাং মক্কা বা কোন দূরবর্তী স্থান থেকে মদীনার পথে যাত্রা কালে হাজীর নিয়ত যেন কবর যিয়ারত না হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কবরকে ঈদ বানাতে নিষেধ করেছেন। তাঁর কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে যে সব হাদীস বর্ণিত ও লোক মাঝে প্রসিদ্ধ আছে তার সবটাই জাল অথবা দুর্বল। যেমন, "যে ব্যক্তি হজ্জ করে অথচ আমার যিয়ারত করে না, সে আমার প্রতি অন্যায় করে।" "যে

ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমার যিয়ারত করল।” “যে আমার যিয়ারত করে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজেব হয়ে যায়।” ইত্যাদি।

মদীনার যিয়ারতকারীর জন্য মুস্তাহাব মসজিদে কুবার যিয়ারত করা ও তাতে নামায পড়া। রসূলুল্লাহ ﷺ ঐ মসজিদের যিয়ারত করতেন এবং তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি বাড়িতে (বাসায়) পবিত্র হয়ে (ওযু করে) কুবার মসজিদে আসে এবং তাতে কোন নামায পড়ে, তাহলে তার একটি উমরাহ করা বরাবর সওয়াব লাভ হয়।” *(আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)* উক্ত দুই মসজিদ ছাড়া আর অন্য কোন মসজিদ যিয়ারত সুন্নত নয়।

অবশ্য বাকী'র কবরসমূহ, শহীদগণের কবরসমূহ যিয়ারত করা সুন্নত। এই সব স্থানে কবর যিয়ারতের যথারীতি দুআ পাঠ করবে। (কোন বাঁধা দুআ পাঠ করবে না এবং কোন মুত্বাওবিফ বা পেশাদার গাইডের খপ্পরে পড়বে না।) আখেরাত স্মরণ করবে, কবরবাসীদের জন্য, তাঁদের আত্মার কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা, করুণা ও আশিস্ প্রার্থনা করবে।

এ ছাড়া তাঁদের কবরের নিকট দুআ কবুল হবে মনে করে দুআ করা, কোন কবরের খাদিম হওয়া, কবরবাসীর নিকট প্রয়োজন ভিক্ষা করা, রোগমুক্তি বা কোন উন্নতি চাওয়া, তাঁদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অসীলায় আল্লাহর নিকট দুআ করা, মক্কা বা মদীনার কোন স্থানের মাটি বর্কতের আশায় সঙ্গে নেওয়া ইত্যাদি বিদআত ও শির্ক; যা শরীয়তে অবৈধ এবং সলফে সালেহীনগণও তা কোন দিন করে যান নি বা করার নির্দেশও দেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু হাজী পাপক্ষয় করতে এসে শির্ক ইত্যাদির বড় পাপের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরে, ফরয আদায় করতে এসে মুশরিক হয়ে দেশে আসে। অনেকের ভাগ্যে কেবল কষ্ট, আড়ম্বর, অর্থব্যয় ও সুনামই থাকে। অনেকে হারাম উপায়ে অর্থোপার্জন করে (সূদ, ঘুষ ইত্যাদির টাকা নিয়ে) হজ্জ করে আসে। বলা বাহুল্য, এমন মানুষদের জীবনে হজ্জ কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। বরং পাপ ও পঙ্কিলতার জীবন পথে তার অবস্থা 'যথা পূর্বং তথা পরং' থাকে, তাহলে মনে প্রশ্ন থাকে যে, এমন লোকদের হজ্জ কবুল হয় কি? আল্লাহই জানেন।

পক্ষান্তরে যে তওহীদবাদীরা হালাল মাল দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যে, তাঁর রসূল ﷺ এর তরীকাহ বা পদ্ধতিমতে কোন প্রকারের গর্হিত ও অবিধেয় কাজে লিপ্ত না হয়ে হজ্জ পালন করে, তাদের জন্য আশা করা যায়, ইনশাল্লাহ- তিনি তাদের 'লাব্বাইক' (হাজির হাজির ডাকে) সারা দেবেন এবং তাদের হজ্জ কবুল করবেন। তারাই নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরবে এবং তাদের আগামী জীবন সেই আলোকে আলোকিত, সংশোধিত ও পরিবর্তিত হবে। আর পরকালে জান্নাতের মহাপুরস্কার লাভ করবে।

কুরবানীর প্রারম্ভিক ইতিহাস

কুরবানীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সেই আদি পিতা আদম ﷺ-এর যুগ থেকেই কুরবানীর বিধান চলে আসছে। আদম ﷺ-এর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিলের কুরবানী পেশ করার কথা আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে জানতে পারি। *(দেখুন সূরা মাইদাহ ২৭ আয়াত)*

হযরত ইবরাহীম ﷺ-এর কুরবানীর আদর্শ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "অতঃপর সে (ইসমাঈল) যখন পিতা (ইবরাহীমে)র সাথে চলা-ফিরার (কাজ করার) বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল, 'হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ।' সে বলল, 'আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।' অনন্তর পিতা-পুত্র উভয়েই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্য অধোমুখে শায়িত করল, তখন আমি ডেকে বললাম, 'হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার পরিবর্তে যবেহ করার জন্য এক মহান জন্তু দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিলাম। আর তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম।" *(সূরা সাফ্ফাত ১০২-১০৮ আয়াত)*

প্রকাশ যে, স্বপ্ন দেখে ইবরাহীম ﷺ-এর ৩ সকাল উঁট কুরবানী করার কথা শুদ্ধ নয়।

"ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
এই দিনই মিনা-ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে'
রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ!"

কুরবানীর ফযীলত

'উয্‌হিয়্যাহ' কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ-যোগ্য উট, গরু, ছাগল বা ভেঁড়াকে বলা হয়। উক্ত শব্দটি 'যুহা' শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ পূর্বাহ্ন। যেহেতু কুরবানী যবেহ করার উত্তম বা আফযল সময় হল ১০ই যুল্‌হজ্জের (ঈদের দিনের) পূর্বাহ্নকাল। তাই ঐ সামঞ্জস্যের জন্য তাকে 'উয্‌হিয়্যাহ' বলা হয়েছে। যাকে 'যাহিয়্যাহ' বা 'আয্‌হাহ'ও বলা হয়। আর 'আযহাহ' এর বহুবচন 'আয্‌হা'। যার সহিত সম্পর্ক জুড়ে ঈদের নাম হয়েছে 'ঈদুল আযহা'। বলা বাহুল্য, ঈদুয্যোহা কথাটি ঠিক নয়।

কুরবানী শব্দটিও 'কুর্ব' ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ নৈকট্য। কুরবান হল, প্রত্যেক সেই বস্তু, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। আর সেখান থেকেই ফারসী বা উর্দু-বাংলাতে গৃহীত হয়েছে 'কুরবানী' শব্দটি।

কুরবানী করা কিতাব, সুন্নাহ ও সর্ববাদিসম্মতিক্রমে বিধেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(   )

'অতএব তুমি নামায পড় তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী কর। *(সূরা আস্‌র ২আয়াত)*

এই আয়াত শরীফে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ﷺ-কে নামায ও কুরবানী এই দু'টি ইবাদতকে একত্রিত করে পালন করতে আদেশ করেছেন। যে দু'টি বৃহত্তম আনুগত্যের অন্যতম এবং মহোত্তম সামীপ্যদানকারী ইবাদত। আল্লাহর রসূল ﷺ সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাই তিনি ছিলেন- অধিক নামায কায়েমকারী ও অধিক কুরবানীদাতা। ইবনে উমর رضي الله عنه বলেন, "নবী ﷺ দশ বছর মদীনায় অবস্থানকালে কুরবানী করেছেন।" *(মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী)*

হযরত আনাস رضي الله عنه বলেন, 'রসূল ﷺ দীর্ঘ (ও সুন্দর) দু'শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত (মেটে বা ছাই) রঙের দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন।' *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি কোন বছর কুরবানী ত্যাগ করতেন না। *(যাদুল মাআদ ২/৩১৭)* যেমন তিনি তাঁর কর্ম দ্বারা কুরবানী করার উপর উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর বাক্য দ্বারাও অনুপ্রাণিত ও তাকীদ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে যবেহ করে সে নিজের জন্য যবেহ করে। আর যে নামাযের পরে যবেহ করে তার কুরবানী সিদ্ধ হয় এবং সে মুসলমানদের তরীকার অনুসারী হয়।" *(বুখারী ৫২২৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" *(মুসনাদ আহমাদ ২/৩২১, ইবনে মাজাহ ২/১০৪৪, হাকেম ২/৩৮৯)*

সকল মুসলিমগণ কুরবানী বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে একমত। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। *(মুগনী ১৩/৩৬০, ফাতহুল বারী ১০/৩)*

তবে কুরবানী করা ওয়াজেব না সুন্নত তা নিয়ে মতান্তর আছে। আর দুই মতেরই দলীল প্রায় সমানভাবে বলিষ্ঠ। যাতে কোন একটার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সহজ নয়। যার জন্য কিছু সংস্কারক ও চিন্তাবিদ্ ওলামা কুরবানী ওয়াজেব হওয়ার পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) অন্যতম। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ফকীহগণের মতে কুরবানী সুন্নাতে মুআক্কাদাহ (তাকীদপ্রাপ্ত সুন্নত)। অবশ্য মুসলিমের জন্য মধ্যপন্থা এই যে, সামর্থ্য থাকতে কুরবানী ত্যাগ না করাই উচিত। ([4]) উচিত নিজের ও পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে কুরবানী করা। যাতে আল্লাহর আদেশ পালনে এবং মহানবী ﷺ এর অনুকরণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হতে পারে।

বস্তুতঃ কুরবানীতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের খাতে অর্থব্যয় (ও স্বার্থত্যাগ) হয়। যাতে তওহীদবাদীদের ইমাম হযরত ইবরাহীম ﷺ-এর সুন্নাহ জীবিত হয়। ইসলামের একটি প্রতীকের বিকাশ ঘটে। পরিবার ও দরিদ্রজনের উপর খরচ করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করা হয়। এত কিছুর মাধ্যমে মুসলিম ঈদের খুশীর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করতে পেরেই মুসলিম আনন্দলাভ করতে পারে। সেই খুশীই তার আসল খুশী। রমযানের সারা দিন রোযা শেষে ইফতারের সময় তার খুশী হয়। পূর্ণ এক মাস রোযা করে সেই বিরাট আনুগত্যের মাধ্যমে ঈদের দিনে তারই আনন্দ অনুভব করে থাকে। এই খুশীই তার যথার্থ খুশী। বাকী অন্যান্য পার্থিব সুখ-বিলাসের খুশী খুশী নয়। বরং তা সর্বনাশের কদমবুসী। আল্লাহ পাক কিছু জাহান্নামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, "এ এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ প্রকাশ করতে।" *(সূরা মু'মিন ৭৫আয়াত)*

কারূনের পার্থিব উৎফুল্লতা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, "স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, (দর্পময়) আনন্দ করো না। অবশ্যই আল্লাহ (দর্পময়) আনন্দকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" *(সূরা ক্বাসাস ৭৬ আয়াত)*

( ) অপরের দান বা সহযোগিতা নিয়ে হজ্জ বা কুরবানী করলে তা পালন হয়ে যাবে এবং দাতা ও কর্তা উভয়েই সওয়াবের অধিকারী হবে। ঋণ করে কুরবানী দেওয়া জরুরী নয়।

অতঃপর জ্ঞাতব্য যে, যেমন হজ্জ না করে তার খরচ সদকাহ করলে ফরয আদায় হয় না, তেমনি কুরবানী না করে তার মূল্য সদকাহ করে অভীষ্ট সুন্নত আদায় হয় না। যেহেতু যবেহ হল আল্লাহর তা'যীম-সম্বলিত এক ইবাদত এবং তাঁর দ্বীনের এক নিদর্শন ও প্রতীক। আর মূল্য সদকাহ করলে তা বাতিল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে কুরবানী নবী ﷺ-এর সুন্নাহ এবং সমগ্র মুসলিম জাতির এক আমল। আর কোথাও কথিত নেই যে, তাঁদের কেউ কুরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য সদকাহ করেছেন। আবার যদি তা উত্তম হত, তাহলে তাঁরা নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম করতেন না। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৬/৩০৪)*

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, 'যবেহ তার স্বস্থানে কুরবানীর মূল্য সদকাহ করা অপেক্ষা উত্তম। যদিও সে মূল্য কুরবানীর চেয়ে পরিমাণে অধিক হয়। কারণ, আসল যবেহই উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট। যেহেতু কুরবানী নামাযের সংযুক্ত ইবাদত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

.( )

অর্থাৎ, অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় ও কুরবানী কর। *(সূরা আসর)*

অন্যত্র বলেন,

.( )

অর্থাৎ, বল, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে। *(সূরা আনআম ১৬২ আয়াত)*

অতএব প্রত্যেক ধর্মাদর্শে নামায ও কুরবানী আছে; যার বিকল্প অন্য কিছু হতে পারে না। আর এই জন্যই যদি কোন হাজী তার তামাত্তু' বা ক্বিরান হজ্জের কুরবানীর বদলে তার তিনগুণ অথবা তার থেকে বেশী মূল্য সদকাহ করে তবে তার পরিবর্ত হবে না। অনুরূপভাবে কুরবানীও। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(তুহফাতুল মাওদূদ ৩৬পৃঃ)*

আরো জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, মূলতঃ কুরবানী যথাসময়ে জীবিত ব্যক্তির তরফ থেকেই প্রার্থনীয়। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে তার সওয়াবে জীবিত অথবা মৃত আত্মীয়-স্বজনকেও শরীক করতে পারে। যেহেতু নবী ﷺ তাঁর সাহাবাবৃন্দ ﷺ নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের তরফ থেকে কুরবানী করতেন।

একাধিক মৃতব্যক্তিকে একটি মাত্র কুরবানীর সওয়াবে শরীক করাও বৈধ; যদি তাদের মধ্যে কারো উপর কুরবানী ওয়াজেব (নযর) না থাকে তবে। রসূল ﷺ নিজের তরফ থেকে, পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে এবং সেই উম্মতের তরফ থেকে কুরবানী করেছেন; যারা আল্লাহর জন্য তওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাঁর জন্য রিসালাত বা প্রচারের সাক্ষ্য দিয়েছে।

(মুসনাদ আহমাদ ৬/৩৯১-৩৯২, বাইহাকী ৯/২৬৮) আর বিদিত যে, ঐ সাক্ষ্য প্রদানকারী কিছু উম্মত তাঁর যুগেই মারা গিয়েছিল। অতএব একই কুরবানীতে কেউ নিজ মৃত পিতামাতা ও দাদা-দাদীকেও সওয়াবে শামিল করতে পারে।

মৃতব্যক্তির তরফ থেকে পৃথক কুরবানী করার কোন দলীল নেই। তবে করা যায়। যেহেতু কুরবানী করা এক প্রকার সদকাহ। আর মৃতের তরফ থেকে সদকাহ করা সিদ্ধ; যা যথাপ্রমাণিত এবং মৃতব্যক্তি তদ্দ্বারা উপকৃতও হবে - ইনশাআল্লাহ। পরন্তু মৃতব্যক্তি এই শ্রেণীর পুণ্যকর্মের মুখাপেক্ষীও থাকে।

যেমন, একটি কুরবানীকে নিজের তরফ থেকে না দিয়ে কেবলমাত্র মৃতের জন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক নয় এবং এতে আল্লাহ তাআলার সীমাহীন করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। বরং উচিত এই যে, নিজের নামের সহিত জীবিত-মৃত অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনকে কুরবানীর নিয়তে শামিল করা। যেমন আল্লাহর নবী ﷺ কুরবানী যবেহ করার সময় বলেছেন, 'হে আল্লাহ! এ (কুরবানী) মুহাম্মদের তরফ থেকে এবং মুহাম্মদের বংশধরের তরফ থেকে।' সুতরাং তিনি নিজের নাম প্রথমে নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বংশধরদেরকেও তার সওয়াবে শরীক করেছেন।

পক্ষান্তরে মৃতব্যক্তি যদি তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কাউকে কুরবানী করতে অসীয়ত করে যায়, অথবা কিছু ওয়াক্ফ করে তার অর্জিত অর্থ থেকে কুরবানীর অসীয়ত করে যায়, তবে অসীর জন্য তা কার্যকর করা ওয়াজেব। কুরবানী না করে ঐ অর্থ সদকাহ খাতে ব্যয় করা বৈধ নয়। কারণ, তা সুন্নাহর পরিপন্থী এবং অসিয়তের রূপান্তর। অন্যথা যদি কুরবানীর জন্য অসিয়তকৃত অর্থ সংকুলান না হয়, তাহলে দুই অথবা ততোধিক বছরের অর্থ একত্রিত করে কুরবানী দিতে হবে। অবশ্য নিজের তরফ থেকে বাকী অর্থ পূরণ করে কুরবানী করলে তা সর্বোত্তম। মোটকথা অসীর উচিত, সূক্ষ্মভাবে অসীয়ত কার্যকর করা এবং যাতে মৃত অসিয়তকারীর উপকার ও লাভ হয় তারই যথার্থ প্রয়াস করা।

জ্ঞাতব্য যে, রসূল ﷺ কর্তৃক আলী ؓ-কে কুরবানীর অসিয়ত করার হাদীস যয়ীফ। *(যআদাঃ ৫৯৬নং, যতিঃ ২৫৫নং, যইমাঃ ৬৭২নং, মিঃ ১৪৬২নং হাদীসের টীকা দ্রঃ)* পরন্তু নবীর নামে কুরবানী করা আমাদের জন্য বিধেয় নয়। তিনি ঈসালে-সওয়াবের মুখাপেক্ষীও নন।

উল্লেখ্য যে, মুসাফির হলেও তার জন্য কুরবানী করা বিধেয়। আল্লাহর রসূল ﷺ মিনায় থাকাকালে নিজ স্ত্রীগণের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন। *(বুখারী ২৯৪, ৫৫৪৮, মুসলিম ১৯৭৫নং, বাইহাকী ৯/২৯৫)*

কুরবানীর মাহাত্ম্য সংক্রান্ত প্রচলিত কতিপয় অচল হাদীস

১। কুরবানীর জানোয়ার কিয়ামতের দিন তার শিং ও পশম এবং খুরসহ অবশ্যই হাজির হবে---। *(যয়ীফ, যয়ীফ তারগীব ৬৭১নং)*

২। কুরবানী তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নত। তার প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে রয়েছে একটি করে নেকী। *(হাদীসটি জাল, যয়ীফ তারগীব ৬৭২নং)*

৩। কুরবানীর প্রথম বিন্দু রক্তের সাথে পূর্বেকার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়। পশুটিকে তার রক্ত ও মাংসসহ দাঁড়িপাল্লাতে ৭০ গুণ ভারী করে দেওয়া হবে। *(হাদীসটি জাল, যয়ীফ তারগীব ৬৭৪-৬৭৫নং)*

৪। ভালো মনে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করলে তা জাহান্নাম থেকে পর্দার মত হবে। *(হাদীসটি জাল, যয়ীফ তারগীব ৬৭৭নং)*

৫। তোমরা তোমাদের কুরবানীকে মোটা-তাজা কর। কারণ তা তোমাদের পুলসিরাত পারের সওয়ারী। *(অতি দুর্বল, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১২৫৫নং)*

কুরবানীর আহকাম

কুরবানী করা আল্লাহর এক ইবাদত। আর কিতাব ও সুন্নায় এ কথা প্রমাণিত যে, কোন আমল নেক, সালেহ বা ভালো হয় না, কিংবা গৃহীত ও নৈকট্যদানকারী হয় না; যতক্ষণ না তাতে দু'টি শর্ত পূরণ হয়েছে;

প্রথমতঃ- ইখলাস। অর্থাৎ, তা যেন খাঁটি আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়।

দ্বিতীয়তঃ- তা যেন আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুযায়ী হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

"যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" *(সূরা কাহফ ১১০ আয়াত)*

সুতরাং যারা কেবল বেশী করে গোশ্ত্ খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী দেয় অথবা লোক সমাজে

নাম কুড়াবার উদ্দেশ্যে মোটা-তাজা অতিরিক্ত মূল্যের পশু ক্রয় করে এবং তা প্রদর্শন ও প্রচার করে থাকে তাদের কুরবানী যে ইবাদত নয় তা বলাই বাহুল্য।

কুরবানীর জন্য কিছু শর্ত রয়েছেঃ-

১- কুরবানীর পশু যেন সেই শ্রেণী বা বয়সের হয় যে শ্রেণী ও বয়স শরীয়ত নির্ধারিত করেছে। আর নির্ধারিত শ্রেণীর পশু চারটি; উঁট, গরু, ভেঁড়া ও ছাগল। অধিকাংশ উলামাদের মতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কুরবানী হল উঁট, অতঃপর গরু, তৎপর মেষ (ভেঁড়া), তারপর ছাগল। আবার নর মেষ মাদা মেষ অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এ প্রসঙ্গে দলীল বর্ণিত হয়েছে। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/৬৩৪)*

একটি উঁট অথবা গরুতে সাত ব্যক্তি কুরবানীর জন্য শরীক হতে পারে। *(মুসলিম ১৩১৮নং)* কিন্তু মেষ বা ছাগে ভাগাভাগি বৈধ নয়। তবে তার সওয়াবে একাধিক ব্যক্তিকে শরীক করা যাবে। সুতরাং একটি পরিবারের তরফ থেকে মাত্র একটি মেষ বা ছাগ যথেষ্ট হবে। তাতে সেই পরিবারের লোক সংখ্যা যতই থাক না কেন।

কিন্তু উঁট বা গরুর এক সপ্তাংশ একটি পরিবারের তরফ থেকে যথেষ্ট হবে কি? এ নিয়ে উলামাগণের মাঝে মতান্তর রয়েছে। কেউ বলেন, যথেষ্ট নয়। কারণ, তাতে ৭ জনের অধিক ব্যক্তির শরীক হওয়া বৈধ নয়। তা ছাড়া পরিবারের তরফ থেকে একটি পূর্ণ 'দম' (জান) যথেষ্ট হবে। আর ৭ ভাগের ১ ভাগ পূর্ণ দম নয়। *(ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ৬/১৪৯)*

অনেকের মতে একটি মেষ বা ছাগের মতই এক সপ্তাংশ উঁট বা গরু যথেষ্ট হবে। *(মাজালিসু আশরি যিলহাজ্জাহ, শুমাইমিরী, ২৬পৃঃ আল-মুমতে' ইবনে উসাইমীন ৭/৪৬২-৪৬৩)*

বলা বাহুল্য, একটি পরিবারের তরফ থেকে এক বা দুই ভাগ গরু কুরবানী দেওয়ার চাইতে ১টি ছাগল বা ভেঁড়া দেওয়াই অধিক উত্তম।

কুরবানীর সাথে একটি ভাগ আকীকার উদ্দেশ্যে দেওয়া যথেষ্ট নয়। যেমন যথেষ্ট নয় একটি পশু কুরবানী ও আকীকার নিয়তে যবেহ করা। কুরবানী ও আকীকার জন্য পৃথক পৃথক পশু হতে হবে। অবশ্য যদি কোন শিশুর আকীকার দিন কুরবানীর দিনেই পরে এবং আকীকা যবেহ করে, তাহলে আর কুরবানী না দিলেও চলে। যেমন, দুটি গোসলের কারণ উপস্থিত হলে একটি গোসল করলেই যথেষ্ট, জুমআর দিনে ঈদের নামায পড়লে আর জুমআহ না পড়লেও চলে, বিদায়ের সময় হজ্জের তওয়াফ করলে আর বিদায়ী তওয়াফ না করলেও চলে, যোহরের সময় মসজিদে প্রবেশ করে যোহরের সুন্নত পড়লে আর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ লাগে না এবং তামাত্তু হজ্জের কুরবানী দিলে আর পৃথকভাবে কুরবানী না দিলেও চলে। *(মানারুস সাবীল ১/২৮০)*

বয়সের দিক দিয়ে উটের পাঁচ বছর, গরুর দুই বছর এবং মেষ ও ছাগের এক বছর হওয়া জরুরী। অবশ্য অসুবিধার ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সী মেষ কুরবানী করা যায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “দাঁতালো ছাড়া যবেহ করো না। তবে তা দুর্লভ হলে ছয় মাসের মেষ যবেহ কর।” *(মুসলিম ১৯৬৩নং)*

কিন্তু উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, ছ'মাস বয়সী মেষের কুরবানী সিদ্ধ হবে; তা ছাড়া অন্য পশু পাওয়া যাক অথবা না যাক। অধিকাংশ উলামাগণ ঐ হাদীসের আদেশকে ইস্তেহবাব (উত্তম) বলে ধরে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ঐ হাদীসের মর্মার্থ এ নয় যে, অন্য কুরবানীর পশু না পাওয়া গেলে তবেই ছ'মাস বয়সের মেষশাবকের কুরবানী বৈধ। যেহেতু এমন অন্যান্য দলীলও রয়েছে যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ বয়সী মেষেরও কুরবানী বৈধ; প্রকাশতঃ যদিও কুরবানীদাতা অন্য দাঁতালো পশু পেয়েও থাকে। যেমন রসূল ﷺ বলেন, “ছ'মাস বয়সী মেষশাবক উত্তম কুরবানী।” *(মুসনাদে আহমাদ ২/৪৪৫, তিরমিযী)*

উকবাহ বিন আমের ﷺ বলেন, (একদা) নবী ﷺ কুরবানীর পশু বিতরণ করলেন। উকবার ভাগে পড়ল এক ছয় মাসের মেষ। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার ভাগে ছয় মাসের মেষ হল?' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, “এটা দিয়েই তুমি কুরবানী কর।” *(বুখারী ২১৭৮, মুসলিম ১৯৬৫নং)*

২- পশু নিম্নোক্ত ত্রুটিসমূহ থেকে যেন মুক্ত হয়;

(ক) এক চোখে স্পষ্ট অন্ধত্ব। (খ) স্পষ্ট ব্যাধি। (গ) স্পষ্ট খঞ্জতা। (ঘ) অন্তিম বার্ধক্য। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “চার রকমের পশু কুরবানী বৈধ বা সিদ্ধ হবে না; (এক চক্ষে) স্পষ্ট অন্ধত্বে অন্ধ, স্পষ্ট রোগা, স্পষ্ট খঞ্জতায় খঞ্জ এবং দুরারোগ্য ভগ্নপদ।” *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

অতএব এই চারের কোন এক ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হয় না। ইবনে কুদামাহ বলেন, 'এ বিষয়ে কোন মতভেদ আমরা জানি না।' *(মুগনী ১৩/৩৬৯)*

ত্রুটিগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ-

(ক) স্পষ্ট কানা (এক চক্ষের অন্ধ) যার একটি চক্ষু ধ্বসে গেছে অথবা বেরিয়ে আছে। দৃষ্টিহীন হলে তো অধিক ত্রুটি হবে। তবে যার চক্ষু সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু নষ্ট হয়নি তার কুরবানী সিদ্ধ হবে। কারণ, তা স্পষ্ট কানা নয়।

(খ) স্পষ্ট রোগের রোগা; যার উপর রোগের চিহ্ন প্রকাশিত। যে চরতে অথবা খেতে পারে না; যার দরুন দুর্বলতা ও মাংসবিকৃতি হয়ে থাকে। তদনুরূপ চর্মরোগও একটি ত্রুটি; যার কারণে চর্বি ও মাংস খারাপ হয়ে থাকে। তেমনি স্পষ্ট ক্ষত একটি ত্রুটি; যদি তার ফলে

পশুর উপর কোন প্রভাব পড়ে থাকে।

গর্ভধারণ কোন ত্রুটি নয়। তবে গর্ভপাত বা প্রসবের নিকটবর্তী পশু একপ্রকার রোগগ্রস্ত এবং তা একটি ত্রুটি। যেহেতু গাভীন পশুর গোশ্ত্ অনেকের নিকট অরুচিকর, সেহেতু জেনেশুনে তা ক্রয় করা উচিত নয়। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট বা ক্রয় করার পর গর্ভের কথা জানা গেলে তা কুরবানীরূপে যথেষ্ট হবে। তার পেটের বাচ্চা খাওয়া যাবে। জীবিত থাকলে তাকে যবেহ করতে হবে। মৃত হলে যবেহ না করেই খাওয়া যাবে। কেননা, মায়ের যবেহতে সেও হালাল হয়ে যায়। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, দারাকুত্বনী, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৩৪৩১নং)* কারো রুচি না হলে সে কথা ভিন্ন।

(গ) দুরারোগ্য ভগ্নপদ। (ঘ) দুর্বলতা ও বার্ধক্যের কারণে যার চর্বি ও মজ্জা নষ্ট অথবা শুষ্ক হয়ে গেছে।

উল্লেখিত হাদীস শরীফটিতে উপরোক্ত ত্রুটিযুক্ত পশুর কুরবানী সিদ্ধ নয় বলে বিবৃত হয়েছে এবং বাকী অন্যান্য ত্রুটির কথা বর্ণনা হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ উলামাগণের মতে, যদি ঐ ত্রুটিসমূহের অনুরূপ বা ততোধিক মন্দ ত্রুটি কোন পশুতে পাওয়া যায় তাহলে তাতেও কুরবানী সিদ্ধ হবে না; যেমন, দুই চক্ষের অন্ধ বা পা কাটা প্রভৃতি। *(শারহুন নওবী ১৩/২৮)*

খাত্তাবী (রঃ) বলেন, হাদীসে একথার দলীল রয়েছে যে, কুরবানীর পশুতে সামান্য ত্রুটি মার্জনীয়। যেহেতু হাদীসের বক্তব্য, "স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগা, স্পষ্ট খঞ্জ" অতএব ঐ ত্রুটির সামান্য অংশ অস্পষ্ট হবে এবং তা মার্জনীয় ও অধর্তব্য হবে। *(মাআলিমুস সুনান ৪/ ১০৬)*

পক্ষান্তরে আরো কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে যাতে কুরবানী সিদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তা মকরূহ বলে বিবেচিত হয়। তাই এ জাতীয় ত্রুটি থেকেও কুরবানীর পশুকে মুক্ত করা উত্তম।

যে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানী মকরূহ তা নিম্নরূপ ঃ-

১। কান কাটা বা শিং ভাঙ্গা। এর দ্বারা কুরবানী মকরূহ। তবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, এতে মাংসের কোন ক্ষতি বা কমি হয় না এবং সাধারণতঃ এমন ত্রুটি পশুর মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু যে পশুর জন্ম থেকেই শিং বা কান নেই তার দ্বারা কুরবানী মকরূহ নয়। যেহেতু ভাঙ্গা বা কাটাতে পশু রক্তাক্ত ও ক্লিষ্ট হয়; যা এক রোগের মত। কিন্তু জন্ম থেকে না থাকাটা এ ধরনের কোন রোগ নয়। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ পশুই আফযল।

২। লেজ কাটা। যার পূর্ণ অথবা কিছু অংশ লেজ কাটা গেছে তার কুরবানী মকরূহ। ভেড়ার পুচ্ছে মাংসপিণ্ড কাটা থাকলে তার কুরবানী সিদ্ধ নয়। যেহেতু তা এক স্পষ্ট কমি এবং ঈপ্সিত অংশ। অবশ্য এমন জাতের ভেঁড়া যার পশ্চাতে মাংস পিণ্ড হয়

না তদ্দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ।

৩। কান চিরা, দৈর্ঘ্যে চিরা, পশ্চাৎ থেকে চিরা, সম্মুখ থেকে প্রস্থে চিরা, কান ফাটা ইত্যাদি।

৪। লিঙ্গ কাটা। অবশ্য মুষ্ক কাটা মকরূহ নয়। যেহেতু খাসীর দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও মাংস উৎকৃষ্ট হয়।

৫। দাঁত ভাঙ্গা ও চামড়ার কোন অংশ অগভীর কাটা বা চিরা ইত্যাদি।

কুরবানী সিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় শর্ত হল মালিকানা। অর্থাৎ, কুরবানীদাতা যেন বৈধভাবে ঐ পশুর মালিক হয়। সুতরাং চুরিকৃত, আত্মসাৎকৃত অথবা অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রীত পশুর কুরবানী সিদ্ধ নয়। তদনুরূপ অবৈধ মূল্য (যেমন সূদ, ঘুস, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির অর্থ) দ্বারা ক্রীত পশুর কুরবানীও জায়েয নয়। যেহেতু কুরবানী এক ইবাদত যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা হয়। আর কুরবানীর পশুর মালিক হওয়ার ঐ সমস্ত পদ্ধতি হল পাপময়। আর পাপ দ্বারা কোন প্রকার নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়। বরং তাতে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না।" *(মুসলিম ১০১৫নং)*

কুরবানীর পশু নির্ধারণে মুসলিমকে সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত, যাতে পশু সর্বগুণে সম্পূর্ণ হয়। যেহেতু এটা আল্লাহর নিদর্শন ও তা'যীমযোগ্য দ্বীনী প্রতীকসমূহের অন্যতম। যা আত্মসংযম ও তাকওয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

"এটিই আল্লাহর বিধান, এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান করলে এতো তার হৃদয়ের তাকওয়া (ধর্মনিষ্ঠা) সঞ্জাত।" *(সূরা হজ্জ ৩২ আয়াত)*

এ তো সাধারণ দ্বীনী প্রতীকসমূহের কথা। নির্দিষ্টভাবে কুরবানীর পশু যে এক দ্বীনী প্রতীক এবং তার যত্ন করা যে আল্লাহর সম্মান ও তা'যীম করার শামিল, সে কথা অন্য এক আয়াত আমাদেরকে নির্দেশ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

( )

"(কুরবানীর) উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম করেছি।" *(সূরা হজ্জ ৩৬ আয়াত)*

এখানে কুরবানী পশুর তা'যীম হবে তা উত্তম নির্বাচনের মাধ্যমে। ইবনে আব্বাস ﷺ প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কুরবানী পশুর সম্মান করার অর্থ হল, পুষ্ট মাংসল, সুন্দর ও বড় পশু নির্বাচন করা।' *(তফসীর ইবনে কাসীর ৩/২২৯)*

রসূল ﷺ এর যুগে মুসলমানগণ দামী পশু কুরবানীর জন্য ক্রয় করতেন, মোটা-তাজা

এবং উত্তম পশু বাছাই করতেন; যার দ্বারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর তা'যীম ঘোষণা করতেন। যা একমাত্র তাঁদের তাকওয়া, আল্লাহভীতি ও আল্লাহপ্রেম থেকে উদ্‌গত হত। *(ফাতহুল বারী ১০/৯)*

অবশ্য মুসলিমকে এই স্থানে খেয়াল রাখা উচিত যে, মোটা-তাজা পশু কুরবানী করার উদ্দেশ্য কেবল উত্তম মাংস খাওয়া এবং আপোসে প্রতিযোগিতা করা না হয়। বরং উদ্দেশ্য আল্লাহর নিদর্শন ও ধর্মীয় এক প্রতীকের তা'যীম এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর সামীপ্যলাভ হয়।

কালো রঙ অপেক্ষা ধূসর রঙের পশু কুরবানীর জন্য উত্তম। মহানবী ﷺ বলেন, "কালো রঙের দুটি কুরবানী অপেক্ষা ধূসর রঙের একটি কুরবানী আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।" (আহমাদ, হাকেম, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৬১নং)

এ পশু ক্রয়ের সময় ত্রুটিমুক্ত দেখা ও তার বয়সের খেয়াল রাখা উচিত। যেহেতু পশু যত নিখুঁত হবে তত আল্লাহর নিকট প্রিয় হবে, সওয়াবেও খুব বড় হবে এবং কুরবানীদাতার আন্তরিক তাকওয়ার পরিচায়ক হবে। কারণ, "আল্লাহর কাছে ওদের (কুরবানীর পশুর) মাংস এবং রক্ত পৌঁছে না, বরং তোমাদের তাকওয়া (ধর্মনিষ্ঠা) পৌঁছে থাকে। এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর; এ জন্য যে তিনি তোমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। সুতরাং (হে নবী!) তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও।" *(সূরা হজ্জ ৩৭ আয়াত)*

কুরবানীদাতা কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর তাকে কথা দ্বারা (মুখে বলে) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করবে এবং কুরবানীর দিন তাকে কুরবানীর নিয়তে যবেহ করবে।

যখন কোন পশু কুরবানীর বলে নির্ণীত হয়ে যাবে, তখন তার জন্য কতক আহকাম বিষয়ীভূত হবে। যেমনঃ-

১। ঐ পশুর স্বত্ব কুরবানীদাতার হাতছাড়া হবে। ফলে তা বিক্রয় করা, হেবা করা, উৎকৃষ্টতর বিনিময়ে ছাড়া পরিবর্তন করা বৈধ হবে না। যেহেতু যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তবে যেহেতু ওর চেয়ে উৎকৃষ্টতর পশুর বিনিময়ে পরিবর্তন করাতে কুরবানীর মান অধিক বর্ধিত হয়, তাই তা বৈধ। আর ওর চেয়ে মন্দতর পশু দ্বারা পরিবর্তন অবৈধ। কারণ, তাতে কুরবানীর আংশিক পরিমাণ হাতছাড়া হয়।

কুরবানীর পশু নির্দিষ্টকারী ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলেও তা বিক্রয় করা বৈধ নয়। বরং তার উত্তরাধিকারীগণ তা যবেহ করে ভক্ষণ করবে, দান করবে ও উপঢৌকন দিবে।

২। যদি তার কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে ঐ ত্রুটি বড় না হলে (যাতে কুরবানী মকরূহ হলেও সিদ্ধ হবে। যেমন, কান কাটা, শিং ভাঙ্গা ইত্যাদি) তাই কুরবানী করবে। কিন্তু ত্রুটি

বড় হলে (যাতে কুরবানী সিদ্ধ হয় না, যেমন স্পষ্ট খঞ্জতা ইত্যাদি) যদি তা নিজ কর্মদোষে হয়, তাহলে তার পরিবর্তে ক্রটিহীন পশু কুরবানী করা জরুরী হবে। আর ঐ ক্রটিযুক্ত পশুটি তার অধিকারভুক্ত হবে। তবে ঐ ক্রটি যদি কুরবানীদাতার কর্মদোষে বা অবহেলায় না হয়, তাহলে ওটাই কুরবানী করা তার জন্য সিদ্ধ হবে।

কিন্তু নির্ণয়ের পূর্বে যদি কুরবানী তার উপর ওয়াজেব থাকে, যেমন কেউ কুরবানীর নযর মেনে থাকে এবং তারপর কোন ছাগল তার জন্য নির্ণীত করে এবং তারপর তার নিজ দোষে তা ক্রটিযুক্ত না হয়ে অন্য কারণে হয়ে থাকে, তা হলেও ক্রটিহীন পশু দ্বারা তার পরিবর্তন জরুরী হবে।

৩। কুরবানীর পশু হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলে, যদি তা কুরবানী দাতার অবহেলার ফলে না হয়, তাহলে তার উপর অন্য কুরবানী জরুরী নয়। কারণ, তা তার হাতে এক প্রকার আমানত, যা সযত্ন সত্ত্বেও বিনষ্ট হলে তার যামানত নেই। তবে ভবিষ্যতে ঐ পশু যদি ফিরে পায়, তবে কুরবানীর সময় পার হয়ে গেলেও ঐ সময়েই তা যবেহ করবে। কিন্তু যদি কুরবানী দাতার অবহেলা ও অযত্নের কারণে রক্ষা না করার ফলে হারিয়ে বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য একটি পশু কুরবানী করা জরুরী হবে।

৪। কুরবানীর পশুর কোন অংশ (মাংস, চর্বি, চামড়া, দড়ি ইত্যাদি) বিক্রয় করা বৈধ হবে না। কারণ, তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্তু, তাই কোনও প্রকারে পুনরায় তা নিজের ব্যবহারে ফিরিয়ে আনা বৈধ নয়। তদনুরূপ ওর কোনও অংশ দ্বারা কসাইকে পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু সেটাও এক প্রকার বিনিময় যা ক্রয়-বিক্রয়ের মত। *(বুখারী ১৬৩০, মুসলিম ১৩১৭নং)*

অবশ্য কসাই গরীব হলে দান স্বরূপ অথবা গরীব না হলে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কুরবানীর গোশ্ত্ ইত্যাদি দেওয়া দূষণীয় নয়। যেহেতু তখন তাকে অন্যান্য হকদারদের শামিল মনে করা হবে; বরং সেই অধিক হকদার হবে। কারণ সে ঐ কুরবানীতে কর্মযোগে শরীক হয়েছে এবং তার মন ওর প্রতি আশান্বিত হয়েছে। তবে উত্তম এই যে, তার মজুরী আগে মিটিয়ে দেবে এবং পরে কিছু দান বা হাদিয়া দেবে। যাতে কোন সন্দেহ ও গোলযোগই অবশিষ্ট না থাকে। *(ফাতহুল বারী ৩/৫৫৬)*

৫। পশু ক্রয় করার পর যদি তার বাচ্চা হয়, তাহলে মায়ের সাথে তাকেও কুরবানী করতে হবে। *(তিঃ ১৫০৩নং)* এর পূর্বে ঐ পশুর দুধ খাওয়া যাবে; তবে শর্ত হল, যেন ঐ বাচ্চা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। (বাইহাকী ৯/২৮৮, আল-মুমতে ৭/৫১০)

যবেহর সময় ও নিয়ত

কুরবানী এক ইবাদত। যা তার নিজস্ব সময় ছাড়া অন্য সময়ে সিদ্ধ হয় না। এই কুরবানীর সময় দশই যুলহজ্জ ঈদের নামাযের পর। নামাযের পূর্বে কেউ যবেহ করলে তার কুরবানী হয় না এবং নামাযের পর ওর পরিবর্তে কুরবানী করা জরুরী হয়।

জুনদুব বিন সুফইয়ান আল বাজালী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সহিত কুরবানীতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি যখন নামায সমাপ্ত করলেন তখন কতক ছাগ ও মেষকে দেখলেন যবেহ করা হয়ে গেছে। অতঃপর বললেন, "যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে যবেহ করেছে, সে যেন ওর পরিবর্তে আর এক পশু যবেহ করে। আর যে ব্যক্তি যবেহ করে নি, সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে।" *(বুখারী, মুসলিম ১৯৬০নং)*

ঈদের খুৎবায় নবী ﷺ বলেন, "আজকের এই দিন আমরা যা দিয়ে শুরু করব তা হচ্ছে নামায। অতঃপর ফিরে গিয়ে কুরবানী করব। অতএব যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের সুন্নাহ (তরীকার) অনুবর্তী। আর যে ব্যক্তি (নামাযের পূর্বে) কুরবানী করে নিয়েছে, তাহলে তা মাংসই; যা নিজের পরিবারের জন্য পেশ করবে এবং তা কুরবানীর কিছু নয়।" *(বুখারী, মুসলিম ১৯৬১নং)*

আর আফযল এটাই যে, নামাযের পর খুতবা শেষ হলে তবে যবেহ করা। যে ব্যক্তি ভালরূপে যবেহ করতে পারে তার উচিত, নিজের কুরবানী নিজের হাতে যবেহ করা এবং অপরকে তার দায়িত্ব না দেওয়া। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ স্বহস্তে নিজ কুরবানী যবেহ করেছেন। এবং যেহেতু কুরবানী নৈকট্যদানকারী এক ইবাদত, তাই এই নৈকট্য লাভের কাজে অপরের সাহায্য না নিয়ে নিজস্ব কর্মবলে লাভ করা উত্তম। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, 'আবু মূসা (রাঃ) তাঁর কন্যাদেরকে আদেশ করেছিলেন যে, তারা যেন নিজের কুরবানী নিজের হাতে যবেহ করে।' *(ফাতহুল বারী ১০/১৯)*

পক্ষান্তরে যবেহ করার জন্য অপরকে নায়েব করাও বৈধ। যেহেতু এক সময়ে নবী ﷺ নিজের হাতে তেষট্টিটি কুরবানী যবেহ করেছিলেন এবং বাকী উঁট যবেহ করতে হযরত আলী ﷺ-কে প্রতিনিধি করছিলেন। *(মুসলিম)*

যবেহ করার সময় বিশেষ লক্ষণীয় ও কর্তব্যঃ-

১। পশুর প্রতি দয়া করা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা। আর তা নিম্ন পদ্ধতিতে সম্ভব;

(ক) সেইরূপ ব্যবস্থা নিয়ে যবেহ করা, যাতে পশুর অধিক কষ্ট না হয় এবং সহজেই সে প্রাণত্যাগ করতে পারে।

(খ) যবেহ যেন খুব তীক্ষ্ম ধারালো অস্ত্র দ্বারা হয় এবং তা খুবই শীঘ্রতা ও শক্তির সাথে যবেহস্থলে (গলায়) পোঁচানো হয়।

ফলকথা, পশুর বিনা কষ্টে খুবই শীঘ্রতার সহিত তার প্রাণ বধ করাই উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে দয়ার নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সহিত হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সহিত যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং বধ্য পশুকে আরাম দেওয়া।" *(মুসলিম ১৯৫৫নং)*

বধ্য পশুর সম্মুখেই ছুরি শান দেওয়া উচিত নয় (মকরূহ)। যেহেতু নবী ﷺ ছুরি শান দিতে এবং তা পশু থেকে গোপন করতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে।" *(মুসনাদ আহমাদ ২/১০৮, ইবনে মাজাহ ৩১৭২নং, সহীহ তারগীব ১/৫২৯)*

আর যেহেতু পশুর চোখের সামনেই ছুরি ধার দেওয়ায় তাকে চকিত করা হয়; যা বাঞ্ছিত অনুগ্রহ ও দয়াশীলতার প্রতিকূল।

তদনুরূপ এককে অপরের সামনে যবেহ করা এবং ছেঁচড়ে যবেহস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়াও মকরূহ।

২। কুরবানী যদি উট হয়, (অথবা এমন কোন পশু হয় যাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়), তাহলে তাকে বাম পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে নহর করা হবে। আল্লাহ পাক বলেন, "সুতরাং দন্ডায়মান অবস্থায় ওদের যবেহকালে তোমরা আল্লাহর নাম নাও।" *(কুঃ ২২/৩৬)* ইবনে আব্বাস ﷺ এই আয়াতের তফসীরে বলেন, 'বাম পা বেঁধে তিন পায়ের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় (নহর করা হবে)।' *(তাফসীর ইবনে কাসীর)*

যদি উট ছাড়া অন্য পশু হয় তাহলে তা বামকাতে শয়নাবস্থায় যবেহ করা হবে। যেহেতু তা সহজ এবং ডান হাতে ছুরি নিয়ে বাম হাত দ্বারা মাথায় চাপ দিয়ে ধরতে সুবিধা হবে। তবে যদি যবেহকারী নেটা বা বেঁয়ো হয় তাহলে সে পশুকে ডানকাতে শুইয়ে যবেহ করতে পারে। যেহেতু সহজ উপায়ে যবেহ করা ও পশুকে আরাম দেওয়াই উদ্দেশ্য।

পশুর গর্দানের এক প্রান্তে পা রেখে যবেহ করা মুস্তাহাব। যাতে পশুকে অনায়াসে কাবু করা

যায়। কিন্তু গর্দানের পিছন দিকে পা মুচড়ে ধরা বৈধ নয়। কারণ, তাতে পশু অধিক কষ্ট পায়।

৩। যবেহকালে পশুকে কেবলামুখে শয়ন করাতে হবে। *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ২/১০৪৩, হাদীসটির সনদে সমালোচনা করা হয়েছে)* অন্যমুখে শুইয়েও যবেহ করা সিদ্ধ হবে। যেহেতু কেবলামুখ করে শুইয়ে যবেহ করা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে কোন শুদ্ধ প্রমাণ নেই। *(আহকামুল উযহিয়্যাহ ৮৮,৯৫পৃঃ)*

৪। যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া ('বিসমিল্লাহ' বলা) ওয়াজেব। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহের বিশ্বাসী হও তবে যাতে (যে পশুর যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা আহার কর।" *(কুঃ ৬/১১৮)* "এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা হতে তোমরা আহার করো না; উহা অবশ্যই পাপ।" *(কুঃ ৬/১২১)*

আর নবী ﷺ বলেন, "যা খুন বহায় এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ কর।" *(বুখারী ২৩৫৬, মুসলিম ১৯৬৮নং)*

'বিসমিল্লাহ'র সহিত 'আল্লাহু আকবার' যুক্ত করা মুস্তাহাব। অবশ্য এর সঙ্গে কবুল করার দুআ ছাড়া অন্য কিছু অতিরিক্ত করা বিধেয় নয়। অতএব বলবে, **'বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিন্‌কা অলাক, আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী।'**
(কেবল নিজের তরফ থেকে হলে)। নিজের এবং পরিবারের তরফ থেকে হলে বলবে,'---**তাক্বাব্বাল মিন্নী অমিন আহলে বাইতী।'** অপরের নামে হলে বলবে, '---**তাক্বাব্বাল মিন** (এখানে যার তরফ থেকে কুরবানী তার নাম নেবে)। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৩৬পৃঃ)*

এই সময় নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করা বিধেয় নয়; বরং তা বিদআত। *(আল-মুমতে ৭/৪৯২)* যেমন '**বিসমিল্লাহ**'র সহিত '**আর রাহমানির রাহীম**' যোগ করাও সুন্নত নয়। যেহেতু এ সম্বন্ধে কোন দলীল নেই। যেমন যবেহ করার লম্বা দুআ 'ইন্নী অজ্জাহ্‌তু' এর হাদীস যয়ীফ। *(যয়ীফ আবূ দাউদ ৫৯৭নং)*

যবেহর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে '**বিসমিল্লাহ**' পাঠ জরুরী। এর পর যদি লম্বা ব্যবধান পড়ে যায়, তাহলে পুনরায় তা ফিরিয়ে বলতে হবে। তবে ছুরি ইত্যাদি হাতে নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়ায় যেটুকু ব্যবধান তাতে '**বিসমিল্লাহ**' ফিরিয়ে পড়তে হয় না।

আবার '**বিসমিল্লাহ**' শুধু সেই পশুর জন্যই পরিগণিত হবে যাকে যবেহ করার সঙ্কল্প করা হয়েছে। অতএব এক পশুর জন্য '**বিসমিল্লাহ**' পড়ে অপর পশু যবেহ বৈধ নয়। বরং অপরের জন্য পুনরায় '**বিসমিল্লাহ**' পড়া জরুরী। অবশ্য '**বিসমিল্লাহ**' বলার পর অস্ত্র

পরিবর্তন করাতে আর পুনরায় পড়তে হয় না।

প্রকাশ যে, যবেহর পর পঠনীয় কোন দুআ নেই।

৫। যবেহতে খুন বহা জরুরী। আর তা দুই শাহরগ (কণ্ঠনালীর দুই পাশে দু'টি মোটা আকারের শিরা) কাটলে অধিকরূপে সম্ভব হয়। প্রিয় নবী বলেন, "যা খুন বহায়, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ কর। তবে যেন (যবেহ করার অস্ত্র) দাঁত বা নখ না হয়।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি, সহীহুল জামে' ৫৫৬৫নং)*

সুতরাং রক্ত প্রবাহিত ও শুদ্ধ যবেহ হওয়ার জন্য চারটি অঙ্গ কাটা জরুরী; শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং পার্শ্বস্থ দুই মোটা শিরা।

৬। প্রাণ ত্যাগ করার পূর্বে পশুর অন্য কোন অঙ্গ কেটে কষ্ট দেওয়া হারাম। যেমন ঘাড় মটকানো, পায়ের শিরা কাটা, চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি জান যাওয়ার আগে বৈধ নয়। অনুরূপভাবে দেহ আড়ষ্ট হয়ে এলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করার পর যদি পুনরায় লাফিয়ে ওঠে তাহলে আরো কিছুক্ষণ প্রাণ ত্যাগ করা কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যেহেতু অন্যভাবে পশুকে কষ্ট দেওয়া আদৌ বৈধ নয়।

পশু পালিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলেও ঘাড় মটকানো যাবে না। বরং তার বদলে কিছুক্ষণ ধরে রাখা অথবা (হাঁস-মুরগীকে ঝুড়ি ইত্যাদি দিয়ে) চেপে রাখা যায়।

যবেহ করার সময় পশুর মাথা যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তার খেয়াল রাখা উচিত। তা সত্ত্বেও যদি কেটে বিচ্ছিন্ন হয়েই যায়, তাহলে তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

যবাই করে ছেড়ে দেওয়ার পর (অসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে) কোন পশু উঠে পালিয়ে গেলে তাকে ধরে পুনরায় যবাই করা যায়। নতুবা কিছু পরেই সে এমনিতেই মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। আর তা হালাল।

প্রকাশ থাকে যে, যবেহ করার জন্য পবিত্রতা বা যবেহকারীকে পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। যেমন মাথায় টুপী রাখা বা মাথা ঢাকাও বিধিবদ্ধ নয়। অবশ্য বিশ্বাস ও ঈমানের পবিত্রতা জরুরী। সুতরাং কাফের, মুশরিক (মাযার বা কবরপূজারী) ও বেনামাযীর হাতে যবেহ শুদ্ধ নয়।

যেমন যবেহ করার আগে কুরবানীর পশুকে গোসল দেওয়া, তার খুর ও শিঙে তেল দেওয়া অথবা তার অন্য কোন প্রকার তোয়ায করা বিদআত।

প্রকাশ থাকে যে, যবেহকৃত পশুর রক্ত হারাম। অতএব তা কোন ফললাভের উদ্দেশ্যে পায়ে মাখা, দেওয়ালে ছাপ দেওয়া বা তা নিয়ে ছুড়াছুড়ি করে খেলা করা বৈধ নয়।

আরাফার দিনের ফযীলত ও কর্তব্য

যুলহজ্জের ফযীলতপূর্ণ দশ দিনের মধ্যে আরাফার দিন অন্যতম। এই দিন পাপক্ষয়ের দিন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দিন। গৃহে অবস্থানকারী মুসলমানদের জন্য রোযা মুস্তাহাব হওয়ার দিন। যে দিনে দ্বীনে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ মুসলমানদের উপর সম্পন্ন হয়েছে। হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁকে ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি বলল, 'হে আমিরুল মুমেনীন! আপনাদের কিতাবের এক আয়াত যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, ঐ আয়াত যদি ইয়াহুদী সম্প্রদায় আমাদের উপর অবতীর্ণ হত, তাহলে (যে দিনে অবতীর্ণ হয়েছে) ঐ দিনটাকে আমরা ঈদ বলে গণ্য করতাম।' তিনি বললেন, 'কোন্ আয়াত?' বলল, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম" (এই আয়াত)। হযরত উমার ﷺ বললেন, 'ঐ দিনটিকে আমরা জেনেছি এবং সেই স্থানটিকেও চিনেছি; যে স্থানে ঐ আয়াত নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি জুমআর দিন আরাফার ময়দানে দন্ডায়মান ছিলেন। *(বুখারী ৪৫, মুসলিম ৩০১৭নং)*

প্রশ্নকারী ছিল কা'ব আল আহবার। যেমন তফসীরে ত্বাবারী (৯/৫২৬) তে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ঐ আয়াত জুমআর দিন এবং আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ দু'টি দিনই আমাদের জন্য ঈদ, আলহামদু লিল্লাহ। ([5])

আরাফার দিনের গুরুত্ব সম্বন্ধে নবী ﷺ বলেন, "আরাফার দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই যেদিন আল্লাহ অধিকরূপে বান্দাকে নরকাগ্নি থেকে মুক্ত করেন ও বলেন, 'কি চায় ওরা?' *(মুসলিম ১৩৪৮-নং)*

ইবনে আব্দুল বার্র বলেন, 'হাদীসটি নির্দেশ করে যে, আরাফায় অবস্থানকারীগণ মার্জিত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত। কারণ, আল্লাহ পাক তওবা ও ক্ষমার পর ছাড়া পাপীদেরকে নিয়ে গর্ব করেন না।

( ) অনেকের ধারণা মতে জুমআর দিন আরাফার (হজ্জের) দিন হলে সেই হজ্জ আকবরী হজ্জ হয় -এ কথাটি ভিত্তিহীন।

অল্লাহু আ'লাম।' *(তামহীদ ১/১২০)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "আরাফার দিন ছাড়া অন্য কোন দিনে শয়তানকে অধিক অপদস্থ, লাঞ্ছিত, হীনতাগ্রস্ত ও ক্রুদ্ধ হতে দেখা যায়নি। যেহেতু সে সেদিন আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হতে এবং মানুষের বড় বড় পাপ মার্জনা হতে দেখে তাই। যেমন বদরের যুদ্ধের দিনও সে অপদস্থ হয়েছিল। যখন জিবরীল ﷺ কে (যুদ্ধের জন্য) ফিরিশ্তাদলের ব্যুহবিন্যাস করতে দেখেছিল।" *(মুঅত্তা মালেক ১/ ৪২২, হাদীসটি মুরসাল যয়ীফ, মিশকাত ২/৭৯৮)*

ইবনে আব্দুল বার্র বলেন, 'ঐ পবিত্র ময়দানে উপস্থিতির ফযীলতের পক্ষে এই হাদীসটি উত্তম। যাতে মুসলিমদেরকে হজ্জ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এই হাদীসের অর্থ একাধিকভাবে সংরক্ষিত এবং এই হাদীস এই কথার উপর দলীল যে, যে ব্যক্তি এই মহা প্রান্তরে উপস্থিত হবে তাকে আল্লাহ পাক মার্জনা করবেন। ইনশাআল্লাহ।'

নবী ﷺ আরো বলেন, "আল্লাহ তাআলা আরাফাত-ওয়ালাদের নিয়ে আসমানবাসী ফিরিশ্তাদের নিকট গর্ব করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, 'আমার বান্দাদেরকে দেখ, আমার নিকট ধূলিমলিন ও আলুথালু রুক্ষ কেশে উপস্থিত হয়েছে!" *(মুসনাদ আহমাদ ২/৩০৫, ইবনে খুযাইমা ৪/২৬৩)*

সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ আরাফার দিনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণনা করে। এটি এমন দিন যাতে দুআ কবুল করা হয়, আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং পাপ মার্জনা করা হয়। তাইতো মুসলিমের উচিত, বিশেষ করে এই মহান দিনে নেক আমল করতে যত্নবান ও প্রয়াসী হওয়া; দুআ, যিক্র, তকবীর, তেলাঅত, নামায, সদকাহ প্রভৃতির মাধ্যমে এই দিনের যথার্থ হক আদায় করা। সম্ভবতঃ কোন বাহানায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাঁর দোযখের ভীষণ শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। ইবনে রজব বলেন, 'এই পুরস্কার সাধারণ সকল মুসলমানদের জন্য।' *(লাত্বায়িফুল মাআরিফ ৩১৫পৃঃ)*

যদি কেউ যুলহজ্জের প্রথম তারীখ থেকে রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে অন্ততঃপক্ষে তাকে এ মাসের ৯ম তারীখে রোযা রাখতে অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু রসূল ﷺ তার গুরুত্ব ও ফযীলতের উপর উম্মতকে বিশেষভাবে অবহিত করে রোযা রাখতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আরাফার দিন রোযা অতীত এক বছর ও আগামী এক বছরের পাপের প্রায়শ্চিত করে।" *(মুসলিম ১৬৬২নং)*

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই রোযা আরাফাতে অবস্থানরত হাজীগণ রাখবেন না। কারণ ঐ দিন খেয়ে-পান করে শক্তি ও দৃঢ়তার সাথে বেশী-বেশী দুআ-যিক্র করার দিন এবং হাজীদের জন্য ঐ মহা-সমাবেশের দিন এক ঈদের দিন। তাই নবী ﷺ ঐ দিনে আরাফাতে

রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন এবং নিজেও আরাফাতে রোযা রাখেন নি। *(বুখারী ১৫৭৫, মুসলিম ১১২৩নং, বায়হাকী ৫/১১৭, মুসনাদ আহমাদ ২/৩০৪, হাকেম ১/৪৩৪, আবূ দাউদ ২৪১৯নং)*

পূর্বে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অহাজীদেরকে পাঁচ ওয়াক্তের জামাআতী নামাযের পর বিশেষভাবে তকবীর পাঠ করতে হয় এবং তা ৯ই যুলহজ্জের ফজর থেকে শুরু হয়ে ১৩ই যুলহজ্জের আসরে সমাপ্ত হয়। ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, 'এ সম্বন্ধে নবী ﷺ কর্তৃক কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। শুদ্ধভাবে যা প্রমাণিত তা হচ্ছে আলী ﷺ, ইবনে মাসউদ ﷺ প্রভৃতি সাহাবাগণের উক্তি।' *(ফাতহুল বারী ২/৪৬২)*

ইবনে কুদামাহ বলেন, 'ইমাম আহমদ (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ হাদীসের ভিত্তিতে মনে করেন যে, আরাফার দিন ফজরের নামাযের পর থেকে তাশরীকের শেষ দিন (১৩ই যুলহজ্জ) পর্যন্ত তকবীর পাঠ করতে হয়?' তিনি বললেন, 'হযরত উমর, আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসঊদ ﷺ (সাহাবাগণের) সর্বসম্মতিক্রমে।' *(মুগনী ৩/২৮৯, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫)*

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) এই তকবীর পাঠকে সঠিক বলে সমর্থন করেন এবং বলেন, 'অধিকাংশ সলফ, ফুকাহায়ে সাহাবা এবং ইমামগণেরও উক্তি এটাই।' *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৪/২২০,২২২)*

ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, 'এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি এবং এর উপরেই (সকলের) আমল।' *(তফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৫৮)*

নামাযের পর যদি কেউ ঐ তকবীর একবার মাত্র পাঠ করে তাহলেই যথেষ্ট। অবশ্য তিনবার পড়াই উত্তম।

সুতরাং মুসলিমগণ ঈদের দিন ও তাশরীকের দিনগুলিতে তকবীর পাঠের উপর সানুরাগ মনোযোগ দেবে। মহিলারা বাড়িতে নামাযের পর অথবা মসজিদে জামাআতে উপস্থিত হলে জামাআতের পর চুপে চুপে তকবীর পাঠ করবে। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, 'মায়মূনাহ (রাঃ) কুরবানীর ঈদের দিন তকবীর পড়তেন এবং মহিলারা আবান বিন উসমান ও উমার বিন আব্দুল আযীযের পশ্চাতে তাশরীকের রাত্রিসমূহে পুরুষদের সহিত মসজিদে তকবীর পাঠ করত।'

দলীলের সহজার্থে এই কথাই প্রকাশ পায় যে, গৃহবাসী ও পথচারী, জামাআতে ও একাকী, আদায় ও কাযা, ফরয ও নফল নামাযের পরে পাঠ করতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে উলামাগণের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। তবে হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, 'ইমাম বুখারীর বাহ্যিক এখতিয়ারে বুঝা যায় যে, (তকবীর উপরোক্ত) সকল মানুষ ও নামাযেই শামিল হবে এবং তিনি যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করেছেন তা ঐ কথার সমর্থন করে।' *(ফাতহুল বারী ২/৪৫৭)*

অনুরূপভাবে মসবুক (যে ইমামের পিছে কিছু রাকআত পায়নি সে)ও বাকী নামায আদায় করে তকবীর পাঠ করবে। যেহেতু তকবীর সালাম ফেরার পর এক বিধেয় যিক্র। আল্লাহু আ'লাম।

কুরবানীর দিনের ফযীলত ও তার অযীফাহ

কুরবানীর দিন এক মহান দিন। এই দিনকে 'হজ্জে আকবার' এর দিন বলা হয়। *(আবূ দাঊদ ৫/৪২০, ইবনে মাজাহ ২/১০১৬)*

এই দিন সারা বছরের শ্রেষ্ঠতম দিন। নবী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর নিকট মহানতম দিন কুরবানীর দিন। অতঃপর স্থিরতার (কুরবানীর পরের) দিন। *(আবূ দাঊদ ৫/১৭৪, মিশকাত ২/৮১০)*

কুরবানীর ঈদ বা ঈদুল আযহা, রোযার ঈদ বা ঈদুল ফিতর অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ঈদুল আযহাতে নামায ও কুরবানী আছে। কিন্তু ঈদুল ফিতরে আছে নামায ও সদকাহ। আর কুরবানী সদকাহ অপেক্ষা উত্তম। আবার কুরবানীর দিনে হাজীদের জন্য স্থান ও কালের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা একত্রিত হয়। যেহেতু ঐ সময় পবিত্র কাবাগৃহের হজ্জ হয়। আর যার পূর্বে আরাফার দিন ও পরে তাশরীকের তিন দিন। এবং এই দিনগুলির সবটাই হাজীদের জন্য ঈদ। *(লাতায়েফুল মাআরিফ ৩১৮পৃঃ)*

এই দিনে কতকগুলি পালনীয় অযীফাহ রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপঃ-

১। ঈদগাহের প্রতি বহির্গমন ঃ-

এই দিনে সুন্দর পোষাক ও বেশ-ভুষায় সজ্জিত হয়ে উত্তম খোশবু মেখে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত। যেহেতু এই দিন সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার দিন। যেমন ঈদের জন্য গোসল করা কিছু সলফ, সাহাবা ও তাবেয়ীন কর্তৃক শুদ্ধভাবে প্রমাণিত আছে। *(ফাতহুল বারী ২/৪৩৯, মুগনী ৩/২৫৬)*

খুবই সকাল সকাল ঈদগাহে পৌঁছে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসার চেষ্টা করবে মুসলিম। এতে নামাযের জন্য প্রতীক্ষার সওয়াব লাভ করবে।

ঈদগাহে যাবার পথে তকবীর পাঠ করবে। ইমাম বের হওয়া (নামাযে দাঁড়ানো) পর্যন্ত ঐ তকবীর পড়া সুন্নত। যুহরী বলেন, লোকেরা ঈদের সময় তকবীর পাঠ করত, যখন ঘর হতে বের হত তখন থেকে শুরু করে ঈদগাহ পর্যন্ত পথে এবং ইমাম বের হওয়া পর্যন্ত ঈদগাহে তকবীর পড়ত। ইমামকে (নামাযে দাঁড়াতে) দেখে সকলেই চুপ হয়ে যেত। পুনরায় ইমাম যখন (নামাযের) তকবীর পড়তেন তখন আবার সকলে তকবীর পড়ত। *(ইবনে আবী শাইবাহ ২/১৬৫, ইরওয়াউল গলীল ৩/১২১)*

সকলেই এই তকবীর উচ্চস্বরে পাঠ করবে। তবে একই সঙ্গে সমস্বরে তকবীর পাঠ বৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, ঈদুল ফিতরের চেয়ে ঈদুল আযহার তকবীর অধিকরূপে তাকীদপ্রাপ্ত। *(মাজমূ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৪/২২১)*

ঈদগাহে পাঁয়ে হেঁটে যাওয়াই সুন্নত। অবশ্য ঈদগাহ দূর হলে অথবা অন্য কোন ওজর ও অসুবিধার ক্ষেত্রে সওয়ার হয়েও যাওয়া চলে। *(মুগনীঃ ৩/২৬২)*

ঈদুল আযহার দিন নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া সুন্নত। আর ঈদুল ফিতরের দিন ইদগাহে বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নত। *(তিরমিযী ৩/৯৮, ইবনে মাজাহ ১/২৯২)*

ইবনুল কাইয়েম বলেন, 'তিনি ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে (কুরবানী করে) কুরবানীর (গোশ্ত) খেতেন।' *(যাদুল মাআদ ১/৪৪১)*

প্রকাশ থাকে যে, ঈদুল আযহার দিনে নামাযের পূর্বে না খাওয়ার নাম হাফ রোযা নয়। আর এই রোযার জন্য ফজরের পূর্বে সেহরী খাওয়াও বিধেয় নয়। পক্ষান্তরে জানা কথা যে, হাফ বলে কোন রোযা শরীয়তে নেই এবং ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম।

২। ঈদের নামায ঃ-

এই নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কোন সক্ষম মুসলিমের জন্য তা ত্যাগ করা বা আদায় করতে অবহেলা করা উচিত নয়। শিশুদেরকেও এই নামাযে উপস্থিত হতে উদ্বুদ্ধ করবে। সৌন্দর্য প্রকাশ না হলে, পর্দার রীতি থাকলে এবং পথে ও ঈদগাহে নারী-পুরুষে মিলা-মিশার ভয় না থাকলে মহিলারা জামাআতে শামিল হবে। বরং পর্দার ব্যবস্থা করে ঈদগাহে মহিলাদেরকে উপস্থিত হয়ে নামায পড়ার বন্দোবস্ত করা জরুরী। যাতে ঋতুবতী মহিলারাও নামাযে না হলেও দুআ ও খুশীতে শরীক হবে। এ ছাড়া পৃথকভাবে কেবল মেয়েদের জন্য কোন বাড়িতে বা মসজিদে ঈদের নামাযের কথা শরীয়তে উল্লেখিত নেই।

অনেক ওলামা যেমন, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়েম, শওকানী, সিদ্দীক হাসান খান প্রভৃতিগণের মতে এই নামায ওয়াজেব।

ঈদের নামাযের জামাআত ছুটে গেলে একাকী দুই রাকআত নামায পড়ে নেবে। *(ফাতহুল বারী ২/৪৭৪)* ঈদের খুতবাহ শোনা সুন্নত। তবে উপস্থিত থেকে তাতে লাভবান হওয়া উচিত। খুতবাহ শেষে (যে পথে গিয়েছিল তার) ভিন্ন পথে বাড়ি ফিরবে। *(বুখারী ৯৪৩নং)*

৩। কুরবানী যবেহ ও গোশ্ত্ বিতরণ ঃ-

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে কুরবানী যবেহর সময় ঈদের খুতবা শেষ হলে শুরু হয়। কুরবানী দাতার জন্য সুন্নত যে, সে তা থেকে খাবে, আত্মীয়-স্বজনকে (তারা কুরবানী দিক,

চাই না দিক) হাদিয়া দেবে এবং গরীবদেরকে সদকাহ করবে। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে বলেন,

( )

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা তা হতে ভক্ষণ কর এবং নিঃস্ব অভাবগ্রস্তদেরকে ভক্ষণ করাও। *(কুঃ ২২/২৮)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, (কুরবানীর গোশ্ত) তোমরা খাও, জমা কর, এবং দান কর।" তিনি আরো বলেন, "তা খাও, খাওয়াও এবং জমা রাখ।" *(মুসলিম ১৯৭১নং)*

উপর্যুক্ত আয়াত বা হাদীসে খাওয়া, হাদিয়া দেওয়া ও দান করার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বিবৃত হয়নি। তবে অধিকাংশ ওলামাগণ মনে করেন যে, সমস্ত মাংসকে তিন ভাগ করে এক ভাগ খাওয়া, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেওয়া এবং এক ভাগ গরীবদেরকে দান করা উত্তম।

কেউ চাইলে সে তার কুরবানীর সমস্ত গোশ্তকে বিতরণ করে দিতে পারে। আর তা করলে উক্ত আয়াতের বিরোধিতা হবে না। কারণ, ঐ আয়াতে নিজে খাওয়ার আদেশ হল মুস্তাহাব বা সুন্নত। সে যুগের মুশরিকরা তাদের কুরবানীর গোশ্ত খেত না বলে মহান আল্লাহ উক্ত আদেশ দিয়ে মুসলিমদেরকে তা খাবার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য কেউ কেউ খাওয়া ওয়াজেবও বলেছেন। *(তফসীর ইবনে কাষীর ৩/২৯২, ৩০০, মুগনী ১৩/৩৮০, মুমতে ৭/৫২৫)* সুতরাং কিছু খাওয়াই হল উত্তম।

কুরবানীর গোশ্ত হতে কাফেরকে তার অভাব, আত্মীয়তা, প্রতিবেশ অথবা তাকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করার জন্য দেওয়া বৈধ। আর তা ইসলামের এক মহানুভবতা। *(মুগনী ১৩/ ৩৮১, ফাতহুল বারী ১০/৪৪২)*

তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি মনসুখ (রহিত) হলেও যেখানে দুর্ভিক্ষ থাকে সেখানে তিন দিনের অধিক গোশ্ত জমা রাখা বৈধ নয়। *(ফাতহুল বারী ১০/২৮, ইনসাফ ৪/১০৭)*

কুরবানীদাতা পশু যবেহ করার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটতে পারে। তবে এতে কুরবানী দেওয়ার সমান সওয়াব লাভ হওয়ার কথা ঠিক নয়। যেমন কুরবানী দিতে না পারলে মুরগী কুরবানী দেওয়া বিদআত।

আর দাড়ি কোন সময়কার জন্য চাঁছা বৈধ নয়। কিন্তু বহু মানুষ আছে যারা কুরবানী করার সাথে সাথে নিজের দাড়িও কুরবানী (?) করে থাকে! কেউ কেউ তো নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই দাড়ি চেঁছে সাজ-সজ্জা করে। অথচ সে এ কাজ করে তিনটি পাপে আলিপ্ত হয় ঃ-
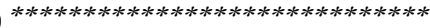
(১) দাড়ি চাঁচার পাপ (২) পাপ কাজের মাধ্যমে ঈদের জন্য সৌন্দর্য অর্জন করার পাপ এবং (৩) কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বে চুল (দাড়ি) কাটার পাপ। *(সালাতুল ঈদাইন, আলবানী ৪০পৃঃ)*

অনুরূপভাবে অধিকাংশ দাড়ি-বিহীন হাজীদেরকে দেখা যায় যে তারা ইহরামের কারণে দাড়ি কিছু বাড়িয়ে থাকে। অতঃপর যখন হালাল হবার সময় হয়, তখন মাথার কেশ মুন্ডনের পরিবর্তে তারা তাদের দাড়ি মুন্ডন করে থাকে! অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ কেশ মুন্ডন করতে উৎসাহিত করেছেন এবং দাড়ি বর্ধন করতে আদেশ করেছেন। অতএব 'ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেউন।'

পরন্তু এই অপকর্মে কয়েকটি বিরুদ্ধাচরণ রয়েছে। (১) দাড়ি বর্ধনের উপর রসূলের আদেশ উল্লংঘন এবং তাতে তাঁর বিরোধিতা। (২) কাফেরদের প্রতিরূপ ধারণ। অথচ মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য ধারণ করে সে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত।" (৩) নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন। অথচ তিনি নারীদের আকৃতি ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন। (৪) (আল্লাহর বিনা অনুমতিতে) আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন এবং শয়তানের প্রতিজ্ঞার আনুগত্য। যেহেতু সে আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন এবং সে (শয়তান) বলে, 'আমি তোমার বান্দাদের একটা নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই, তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই, এবং তাদেরকে অবশ্যই নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। *(সূরা নিসা ১১৮-১১৯ আয়াত)*

৪। ঈদের মুবারকবাদ ঃ-

ঈদের দিন এক অপরকে মুবারকবাদ দেওয়ায় ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে কোন দোষ নেই। যেমন, **'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিনকুম'** (আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের নিকট থেকে ইবাদত মঞ্জুর করেন), ঈদ মুবারক ইত্যাদি দুআমূলক বাক্য বলে এক অপরকে সাক্ষাৎ করা বৈধ।

যেহেতু ঈদে ও অন্যান্য খুশীতে মুবারকবাদ দেওয়া, বর্কত, মঙ্গল ও মঞ্জুরের দুআ করা) ইসলামে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত।

যেমন, সাহাবাগণ ঈদগাহ হতে ফিরার সময় এক অপরকে বলতেন, '**তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিনক্**। *(হাবী ১/৮২, ফাতহুল বারী ২/৪৪৬, তামামুল মিন্নাহ ৩৫৪পৃঃ)*

অন্যান্য খুশীর বিষয়ে মুবারকবাদ দেওয়ার ব্যাপারেও ইসলামে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন হযরত আনাস ﷺ বলেন, (বিজয়ের খবর নিয়ে) যখন "---এ এজন্য যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন---" এই আয়াতটি *(কুঃ ৮৮/২)* হুদাইবিয়া থেকে ফিরার পথে নবী ﷺ এর উপর অবতীর্ণ হল তখন তিনি বললেন, "আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা ধরাপৃষ্ঠে সমগ্র বস্তু থেকে আমার নিকট প্রিয়তম।" অতঃপর তিনি তাঁদের (সাহাবাদের) কাছে তা পড়ে শুনালেন। তা শুনে সাহাবাগণ বললেন, 'যে জিনিস আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন তার উপর আপনাকে মুবারকবাদ---।' *(বুখারী ৩৯৩৯, মুসলিম ১৭৮৬নং)*

অনুরূপভাবে যখন কা'ব বিন মালেক ﷺ-এর তওবা কবুল হল তখন তাঁকে মুবারকবাদ দেওয়া হয়েছিল। *(বুখারী ৪১৫৬, মুসলিম ২৭৬৯নং)*

বিবাহ-শাদীতে আল্লাহর রসূল ﷺ 'বারাকাল্লাহু লাকা অবারাকা আলাইক---' বলে বরকে মুবারকবাদের দুয়া দিতেন। *(বুখারী ৪৮৬০, মুসলিম ১৪২৭নং)*

অবশ্য ঈদের খুশীতে মুবারকবাদ দেওয়ার ব্যাপারে নবী ﷺ কর্তৃক কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। তবে কিছু সাহাবা ও তাবেয়ীন হতে এ কথা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত আছে। অতত্রব কেউ এ কাজ করলে করতেও পারে এবং ছাড়লে ছাড়তেও পারে। *(মাজমূ ফাতাওয়া ২৪/২৫৩)*

শায়খ আব্দুর রহমান সা'দী বলেন, 'বিভিন্ন উপযুক্ত শুভক্ষণে মুবারকবাদ শরীয়তের এক ফলপ্রসূ বৃহৎ মূলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, যাবতীয় কথা ও কাজের দেশাচার ও প্রথার মূল হচ্ছে বৈধতা। অতএব কোন আচার বা প্রথাকে হারাম করা যাবে না; যতক্ষণ না ঐ প্রথা বা আচারকে শরীয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অথবা তাতে কোন বিঘ্ন বা ক্ষতি প্রকাশিত না হয়েছে।

এই বৃহৎ মূলের সপক্ষে কিতাব ও সুন্নাহর সমর্থনও রয়েছে। সুতরাং লোকেরা এই মুবারকবাদকে কোন ইবাদত বলে মনে করে না। বরং তা একটা প্রচলিত রীতি মনে করে; যাতে শুভক্ষণে খুশির সহিত এক অপরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে থাকে এবং তাতে কোন বাধা বা বিঘ্নও নেই। বরং তাতে উপকারই আছে; যেমন, মুসলিমরা এক অপরকে এর মাধ্যমে উপযুক্ত দুআ দিয়ে থাকে এবং তাতে আপোসে সৌহার্দ্য, ভালবাসা ও সম্প্রীতি সঞ্চার

ও বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তাই রীতির সহিত যখন কোন লাভ ও মঙ্গল যুক্ত হয় তখন তা তার ফল হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। *(ফাতাওয়া সা'দিয়্যাহ ৪৮৭পৃঃ, হাবী ১/৭৯)*

৫। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সাক্ষাৎ ঃ-

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও জ্ঞাতি-বন্ধনের দাবী এই যে, বিশেষ করে ঈদের দিন তাদের যিয়ারত করা। তাদের অবস্থা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা, ঈদের খুশী ও সুখে তাদের শরীক হওয়া। পিতামাতা থেকে পৃথক থাকলে (বা এক বাড়িতে না থাকলে) তাদের যিয়ারত পুত্রের জন্য সুনিশ্চিত হয়। অতঃপর আত্মীয়-স্বজনদের যিয়ারত ও তার পর দ্বীনী ভাই-বন্ধুদের যিয়ারত করা কর্তব্য। সুতরাং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের যিয়ারতকে পিতা-মাতার যিয়ারতের উপর প্রাধান্য দেওয়া আদৌ বৈধ নয়।

যেমন, এই যিয়ারতে বেগানা নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর অবাধ মিলামিশা, পর্দাহীনতা, নারীদের নানান সাজ-সজ্জা ও অঙ্গরাগে সুগন্ধ মেখে গায়ের মাহরাম (গম্য) পুরুষদের সহিত সাক্ষাৎ ও মুসাফাহাহ করা, খেলা, ছবি তোলা ইত্যাদি হারাম।

জ্ঞাতি-বন্ধন জাগরূক রাখার জন্য ঈদ এক বড় শুভপর্ব। যেদিন প্রায় সকলের মুখে হাসির ফুলকুঁড়ি ফুটে ওঠে। কিন্তু এমন অনেক মানুষ থাকে, যাদের সে হাসি ওষ্ঠাধরে পৌঁছনোর পূর্বে হৃদয় মাঝেই বিলীন হয়ে যায়। তারা খুশীর স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হয় না। বরং মনঃকষ্টে অনেকের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়। এমন লোকদেরকে বেছে তাদের হাসি ফুটিয়ে তুলতে সহযোগিতা করা এক মহান কাজ। ঐ দিনে আত্মীয় ও প্রতিবেশীর কোন অনাথ, এতীম, দুঃস্থ, দাস-দাসী, বিধবা অভাগিনীদের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এ উপলক্ষে তাদেরকে কিছু উপহার দিয়ে সান্ত্বনা দান মহৎ লোকের কাজ।

৬। ঈদের দিন সৎকাজ করা ও তার শুক্র (কৃতজ্ঞতা) আদায় করার দিন। অতএব ঐ দিনকে গর্ব, অহংকার, নজরবাজি, তাসবাজি, আতশবাজি ও অন্যান্য অবৈধ খেলা, সিনেমা বা অবৈধ ফিল্ম্ দর্শন, গান-বাজনা শোনা, মাদকদ্রব্য সেবন প্রভৃতির মাধ্যমে অবৈধ হর্ষোৎফুল্ল দিন বানানো কোন মুসলিমের জন্য সমুচিত নয়। নচেৎ নেক আমলের শুকরিয়া আদায়ের বদলে কৃত আমলের ফলই নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য এই পবিত্র খুশির দিনে ছোট শিশু কন্যারা 'দুফ' (ঢপঢপে আওয়াজবিশিষ্ট একমুখো ঢোলক) বাজিয়ে

মার্জিত বৈধ গজল ইত্যাদি গাইতে পারে।

সতর্কতার বিষয় যে, বিশেষ করে ঈদের দিন ঈদের নামাযের পর পিতামাতা বা কোন আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারতের প্রথা ইসলামে নেই। এ অভ্যাসটিকে কর্তব্য মনে করলে নিঃসন্দেহে তা বিদআত হবে। *(আহকামুল জানায়েয, আলবানী ২৫৮পৃঃ)*

তাশরীকের দিনসমূহের ফযীলত

১১, ১২, ১৩ই যুল হজ্জকে 'আইয়্যামে তাশরীক' বলা হয়। তাশরীকের অর্থ হল, রৌদ্রে গোশ্ত্ শুকানো। যেহেতু এই দিনগুলিতে কুরবানীর গোশ্ত্ বেশী দিন রাখার জন্য রৌদ্রে শুকানো হত, তাই উক্ত দিনগুলির এই নামকরণ হয়।

এ দিনগুলিও শ্রেষ্ঠ ও ফযীলতপূর্ণ দিনসমূহের অন্যতম; যে মহান কাল-সময়ে আল্লাহ পাক তাঁর যিক্র করতে আদেশ করেছেন। *(কুঃ ২/২০৩)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আইয়্যামে মা'লূমাত' (বিদিত দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হল, (যুলহজ্জের) দশ দিন এবং 'আইয়্যামে মা'দূদাত' (নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হল, তাশরীকের (কুরবানী ঈদের পরের তিন) দিনসমূহ। আর এই ব্যাখ্যা অধিকাংশে উলামার। *(ফাতহুল বারী ২/৪৫৮, লাতায়িফুল মাআরিফ ৩২৯পৃঃ)*

মুফাস্সির কুরতুবী বলেন, 'উলামাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, 'আইয়্যামে মা'দূদাত' এর উদ্দেশ্য মিনার দিনসমূহ এবং তাই তাশরীকের দিন। আর এই তিনটি নাম ঐ দিনগুলির জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এই আয়াতে যিক্র করার আদেশ নিয়ে হাজী-অহাজী নির্বিশেষে সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর বিশেষ করে নামাযসমূহের সময়ে -তাতে নামাযী একাকী হোক অথবা জামাআতে- যিক্র করতে নির্দেশ করা হয়েছে। এ কথার উপর সাহাবা ও তাবেয়ীনদের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত।' *(তফসীর কুরতুবী ৩/১,৩)*

রসূল ﷺ বলেছেন, "তাশরীকের দিনগুলি পান-ভোজনের ও যিক্র করার দিন।" *(মুসলিম ১১৪১নং)*

তিনি আরো বলেছেন, (যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) "আরাফাহ, কুরবানী ও তাশরীকের দিনসমূহ আহলে ইসলাম, আমাদের ঈদ।" আর আল্লাহর নিকট সর্বমহান দিন কুরবানীর দিন। অতঃপর তাশরীকের (ঈদের দ্বিতীয়) দিন।"

আইয়্যামে তাশরীক শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ দিন। যেহেতু এ দিনগুলি যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের সংলগ্নেই পড়ে; যার ফযীলত এই পুস্তিকার প্রারম্ভে আলোচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এই দিনগুলিতে হজ্জের কিছু আমল পড়ে, যেমন রম্‌ই, তওয়াফ ইত্যাদি। যাতে মূল শ্রেষ্ঠত্বে ঐ দিনগুলির সহিত মিলিত হয়। যেমন তকবীর বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে দুই প্রকারের দিনগুলিই সম্পৃক্ত।

উপর্যুক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, তাশরীকের দিনগুলিও পান-ভোজনের দিন। আনন্দ ও খুশী করার, আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষাৎ করার এবং বন্ধু-বান্ধব মিলে ফলপ্রসূ বৈঠক করার দিন। এই দিনগুলিতে অধিকরূপে উত্তম খান-পান; বিশেষ করে মাংস ব্যবহার করা দূষনীয় নয়। তবে তাতে যেন কোন প্রকারের অপচয়, নষ্ট ও আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা না হয়।

এই দিনগুলি আল্লাহকে বিশেষভাবে স্মরণ ও তার যিক্‌র করার দিন। এই যিক্‌র হবে বিবিধ প্রকারেরঃ-

১। প্রতি ফরয নামাযের পর তকবীর পাঠ। যা তাশরীকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত পড়তে হয়। অবশ্য অনেক উলামাগণ মনে করেন যে, তকবীর কেবল নামাযের পরেই সুনির্দিষ্ট নয়। বরং এই দিনগুলিতে যে কোন সময় সর্বদা পড়াই উত্তম।

অভিমতটি অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলিকে যিক্‌র দ্বারা বিশিষ্ট করেছেন। কিন্তু তাতে কোন নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট করেন নি। তিনি বলেন, "এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহর যিক্‌র কর।" *(কুঃ ২/২০৩)* আর এই আদেশ হাজী-অহাজী সকলের জন্য সাধারণ। তদনুরূপ রসূল ﷺ ও বলেন, "এই দিনগুলি আল্লাহর যিক্‌র করার দিন।" অতএব এই নির্দেশ পালন স্পষ্টভাবে তখনই সম্ভব হয় যখন তকবীরাদি সর্বাবস্থায় (যে অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করা চলে) পাঠ করা হয়। যেমন, নামাযের পরে, মসজিদে, বাড়িতে, পথে, মাঠে ইত্যাদিতে। *(নাইলুল আওতার ৩/৩৫৮)*

২। কুরবানী যবেহ করার সময় তাসমিয়াহ ও তাকবীর পাঠ।

৩। পান ও ভোজনের পর যিক্‌র ও দুআ। যেহেতু দিনগুলি অধিক রূপে খাওয়া ও পান করার দিন, যাতে পূর্বে আল্লাহর নাম ও পরে তার প্রশংসা করায় যিক্‌র হয়।

৪। (হাজীদের জন্য) রম্‌ই জিমার করার সময় তকবীর পাঠ।

সুতরাং মুসলিমকে গাফলতি থেকে সতর্ক হওয়া উচিত। তার উচিত, এই সময়গুলিতে আল্লাহর যিক্‌র ও নেক আমল দ্বারা আবাদ করা। নচেৎ আল্লাহ-ভোলা মানুষদের মত ফালতু বেশী বেশী রাত্রি জেগে কোন বিলাস ও প্রমোদ যন্ত্রের সম্মুখে বসে শুক্‌রিয়ার

পরিবর্তে পাপ করা আদৌ উচিত নয়।

অধিক খেয়ে-পান করে আল্লাহর যিক্র ও ইবাদতে সাহায্য নেওয়ায় তাঁর নিয়ামতের এক প্রকার শুকরিয়া আদায় করা হয়। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত দ্বারা উদরপূর্তি করে তার অবাধ্যাচরণ ও পাপকাজে সাহায্য নেওয়ায় তাঁর অকৃতজ্ঞতা করা হয়। আর তাঁর দেওয়া সম্পদকে অস্বীকার করলে এবং তাঁর কৃতঘ্নতা করলে কখনো তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে সম্পদ অধিকরূপে বর্ধমান হতে থাকে।

যেহেতু তাশরীকের দিনগুলিকেও ঈদ বলা হয়েছে, তাই তাতে কোন প্রকারের রোযা পালন করা শুদ্ধ নয়। কারো অভ্যাসমত যদিও এই দিনগুলিতে রোযা পড়ে, তবুও তার পরবর্তী কোন দিনে রেখে নেবে এবং এই দিনগুলিতে খান-পানের মাধ্যমে আল্লাহর যিক্র করবে। *(লাতায়িফুল মাআরিফ ৩৩৩পৃঃ)*

অবশ্য যে তামাত্তু হজ্জের হাজী কুরবানী দিতে সক্ষম না হয়, সে এই দিনগুলিতে তিনটি রোযা পালন করবে কিনা তা নিয়ে মতান্তর আছে। অনেকে বলেন, 'কেবল ঐ হাজী রোযা রাখবে। কারণ আল্লাহ বলেন, "অতএব যে ব্যক্তি (কুরবানী) না পায় সে হজ্জে তিনটি রোযা (পালন করবে)। *(কুঃ ২/১৯৬)* আর 'হজ্জে' বলতে কুরবানীর পূর্বের ও পরের দিনকেও বুঝায়।' পরন্তু হযরত ইবনে উমার ﷺ এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, 'কুরবানী দিতে অক্ষম এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখার অনুমতি নেই।' *(বুখারী ১৮৯৮, ফাতহুল বারী ৪/২৪৩, নাইলুল আওতার ৪/২৯৪)*

তাশরীকের দিনগুলিতেও কুরবানী যবেহ করা যায়। তাই সর্বমোট চার দিন কুরবানী বৈধ। যেহেতু তাশরীকের দিন, কুরবানীর পরের তিন দিনকে বলা হয়। *(তাফসীর ইবনে কাসীর ৫/৪১২, আল-মুমতে ৭/৪৯৯)* আর নবী ﷺ বলেন, "তাশরীকের সমস্ত দিনগুলিতেই যবেহ করা যায়।" *(আহমাদ ৪/৮২, বাইহাকী ৯/২৯৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/৬১৭)* যেমন দিনের বেলায় সুযোগ না হলে রাতেও কুরবানী যবেহ করা যায়। *(আল-মুমতে ৭/৫০৩)* রাতে কুরবানী যবেহ করার ব্যাপারে হাদীস সহীহ নয়। *(মাযাঃ ৪/২৩)* আর নামাযের নিষিদ্ধ সময়গুলোতে কুরবানী যবেহ করা নিষিদ্ধ নয়।

হজ্জ সম্পর্কিত কিছু ফতোয়া

ঋণ করে হজ্জ করা যায়, যদি পরিশোধ করার সহজ উপায় থাকে (অথবা ঋণের তাগাদা না থাকে) তবে। অন্যথা ঋণ করে হজ্জ না করাই ভালো। কারণ সম্ভবতঃ ঋণ করার পরে পরিশোধ করার সামর্থ্য নাও হতে পারে। রোগাক্রান্ত বা মৃত্যু-কবলিত হলে পরিশোধ নাও হতে পারে। অতএব পূর্ণ সামর্থ্যবান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৭৫)*

সরকারকে ধোকা দিয়ে জাল নাম ও পাশপোর্ট নিয়ে হজ্জ করলে হজ্জ হয়ে যাবে, তবে ধোকা দেওয়ার জন্য গোনাহগার হতে হবে। *(ঐ ২/৬৭৫)*

বহুদিন সঊদিয়ায় থেকে ছুটির সময় হজ্জ হলে এবং পরিবার-পরিজন হজ্জ না করে বাড়ি ফিরতে আদেশ করলে এবং হজ্জ করাতে তাদের সম্মতি না হলে, যদি ফরয হজ্জ হয় তবে তাদের কথা না মেনে হজ্জ করবে, অতঃপর বাড়ি ফিরবে। নফল হলে তাদের মন খুশী করার জন্য হজ্জ না করে বাড়ি ফিরবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৭)*

স্ত্রী হজ্জ করতে চাইলে এবং স্বামী তাতে বাধা দিলে স্বামীর কথা না মেনে কোন মাহরামের সাথে অবশ্যই হজ্জ করবে। স্বামীর বাধা মানলে গোনাহগার হয়ে মরতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/ ১৮৪)*

উড়ো কিংবা পানি-জাহাজে হজ্জ বা উমরায় এলে নির্দিষ্ট মীকাত বরারবর জায়গায় আসার

পূর্বে (জাহাজের কর্মীদের ইঙ্গিত পেলে) ইহরাম বাঁধতে হবে। অবশ্য চড়ার পূর্বে এয়ারপোর্ট থেকে গোসলাদি সেরে কাপড় পরে এখানে কেবল নিয়ত করা ভালো। জিদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা যথেষ্ট নয়। বিনা ইহরামে জিদ্দায় নামলে নির্দিষ্ট মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। জিদ্দা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করে থাকলে দম (একটি ছাগল অথবা ভেঁড়া অথবা সাত ভাগের এক ভাগ গরু বা উঁট) লাগবে; যা মক্কায় যবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করতে হবে। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৩৪পৃঃ)*

অবশ্য যদি কেউ না জেনে কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করে 'জিদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা হবে' এই ফতোয়া নিয়ে জিদ্দা থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্জ উমরাহ করে ফেলে, তবে তার উপর দম নেই। কারণ, সে তার ওয়াজেব পালন করেছে। আর ঐ ভুলের মাসূল ঐ মুফতীর ঘাড়ে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৫৬৯)*

সফরের শুরুতেই মদীনা যাওয়ার নিয়ত থাকলে পথে মীকাতে ইহরাম না বেঁধে মদীনার যিয়ারতের পর মদীনা থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা এসে হজ্জ-উমরাহ করা চলবে।

নির্দিষ্ট মীকাতের পূর্বেও ইহরাম বাঁধা চলে। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ১২পৃঃ)* অবশ্য নির্দিষ্ট মীকাত হতেই ইহরাম বাঁধা উত্তম।

হজ্জ ও উমরার নিয়ত না থাকলে মক্কা প্রবেশের জন্য ইহরাম বাঁধতে হবে না। কিন্তু মক্কায় কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি বা ব্যবসার জন্য আসার পর উমরাহ করার ইচ্ছা হলে হারাম-সীমার বাইরে বের হয়ে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করবে। হজ্জ করার ইচ্ছা হলে ঐ বাসস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ২২পৃঃ)* মিনায় থাকলে মিনা থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। *(ঐ ২৬পৃঃ)*

পূর্ব থেকেই হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীকাতের সীমা অতিক্রম করে সীমার ভিতরে কোন শহরে আত্মীয়-বাড়িতে থেকে সেখান থেকেই ইহরাম বা হজ্জ করলে দম লাগবে। নচেৎ মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসবে। অবশ্য মীকাত অতিক্রম করার সময় হজ্জ বা উমরার নিয়ত না থাকলে এবং পরে আত্মীয়-বাড়িতে ঐ নিয়ত হলে এ বাড়ি থেকেই ইহরাম বাঁধতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৯/১৬৯)*

ইহরাম বাঁধার পর কোন কারণবশতঃ হজ্জ (বা উমরাহ) সারতে না পারলে যথাস্থানে একটি কুরবানী করে মাথার কেশ মুন্ডন বা কর্তন করে হালাল হয়ে বাড়ি ফিরবে। অবশ্য ইহরামের সময় শর্ত লাগিয়ে থাকলে তার উপর কিছু ওয়াজেব নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১৩৮)*

তামাত্তু হজ্জের নিয়তে উমরাহর ইহরাম বেঁধে উমরাহ সেরে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্বে

যদি কোন কারণবশতঃ বাড়ি ফিরতে হয় বা হজ্জ করা না হয়, তাহলে তার উপরও কিছু ওয়াজেব হবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২১০)* উমরাহর ইহরাম বেঁধে কেউ অকারণে উমরাহ না করে ফিরে গিয়ে জেনে-শুনে ইহরাম খুলে ফেললে ১টি কুরবানী করবে, অথবা তিন দিন রোযা পালন করবে অথবা ছয়টি মিসকীন (নিঃস্ব)কে মাথা পিছু অর্ধ সা (সওয়া এক কিলো) করে খাদ্য (চাল) সদকাহ করবে। (আর এই খাদ্য ও মাংস হারাম শরীফের মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে হবে।) স্ত্রী-সহবাস করলে দম লাগবে এবং মক্কা ফিরে এসে উমরাহ অবশ্যই পুরা করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৩০০)*

তামাত্তুর উমরারা পর মদীনার যিয়ারতে গেলে অথবা কোন প্রয়োজনে মীকাতের বাইরে গেলে পুনরায় হজ্জের জন্য আসার সময় মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা জরুরী। এই ইহরামে আরো একটি উমরাও করতে পারে।

ক্বিরান বা তামাত্তু হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে পুনরায় ইফরাদের নিয়ত হয় না। যেমন হজ্জের মাসে উমরাহ সেরে মদীনা বা কোন (স্বগৃহ ছাড়া) সফরে গেলে হজ্জের সময় ফিরে এসে ইফরাদ হয় না। অবশ্য ক্বিরানের নিয়ত করে তামাত্তুর নিয়ত করা যায়। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৩৬পৃঃ)*

নিজের নামে হজ্জের বা উমরাহর নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে মীকাত পার হয়ে পরে অন্যের নামে পরিবর্তন করা যায় না। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৭৬)*

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী দেওয়ার ভয়ে ইফরাদের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সেরে পুনরায় তানঈম-এ গিয়ে উমরাহর ইহরাম বেঁধে উমরাহ করা শরীয়তের নির্দেশ ও নিয়মের ব্যতিক্রম এবং এমন করা শরীয়তের সাথে ছল-বাহানা করার নামান্তর। *(হাজ্জাতুন্নাবী, আলবানী ২০পৃঃ)*

পেশাব ঝরার রোগ থাকলে ইহরামের কোন ক্ষতি হয় না। নামায ও তওয়াফের পূর্বে ইস্তেনজা করে ওযু জরুরী। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ২৪পৃঃ)*

তালবিয়াহ পড়তে ভুলে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ তা সুন্নত। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ১৭পৃঃ)*

ইহরাম অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বিড়াল মেরে ফেললে কিছু ওয়াজেব নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৭৬)*

উমরাহ করতে গিয়ে পূর্বেই মহিলার মাসিক শুরু হয়ে গেলে পবিত্রতার অপেক্ষা করবে। সফর করা জরুরী হলে ইহরাম অবস্থায় থেকে সফর করে পুনরায় ফিরে এসে উমরাহ আদায় করবে। কিন্তু বহির্দেশের হলে খরচ, ভিসা ইত্যাদির ঝামেলা থেকে বাঁচতে উমরাহ করে নিতে পারবে। অর্থাৎ, ভিসা শেষ হওয়ার ভয় থাকলে লজ্জাস্থানে পটি বেঁধে নিয়ে তওয়াফ ও সাঈ করে চুলের ডগা কেটে উমরাহ সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাবে। যেহেতু ঐ সময় তওয়াফ করা

তার জন্য জরুরী প্রয়োজন। আর অতি প্রয়োজন ও অসুবিধার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ জিনিষ বৈধ হয়ে যায়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৪৩)* তবে হজ্জের উমরাহ হলে হজ্জের কাজ সারার পর উমরাহ করে নেবে।

অনুরূপ তওয়াফে ইফাযার পূর্বে মাসিক শুরু হলে তওয়াফ ও সাঈ ছাড়া হজ্জের সব কিছুই করবে। অতঃপর সফর করার আগে পবিত্রা না হলে এবং সফর জরুরী হলে সফর করবে। কিন্তু বাড়িতে ঐ ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। স্বামীর সহিত কোন প্রকার যৌনাচারে লিপ্ত হবে না। অতঃপর পবিত্রা হলে মক্কায় ফিরে এসে তওয়াফ ও সাঈ করবে। যদি ফিরে আসা অসম্ভব হয় তাহলে মাসিক বন্ধ করার ইঞ্জেকশন (বা ট্যাবলেট) ব্যবহার করবে। তা সম্ভব না হলে লজ্জাস্থানে পটি বেঁধে তওয়াফ করে নেবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৩৭)*

তওয়াফ ও সাঈ করার পর পুনরায় খুন দেখলে, যদি তা সত্যই মাসিকের খুন হয় তবে পুনরায় তওয়াফ ও সাঈ করতে হবে। যেহেতু অপবিত্রতার কারণে পূর্বের তওয়াফ-আদি বাতিল হয়ে যাবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৪৭)*

তওয়াফে ইফাযাহ করা কালীন সময়ে কোন মহিলার মাসিক শুরু হলে তওয়াফ ছেড়ে মসজিদের বাইরে চলে যাবে। কিন্তু লজ্জায় বলতে না পেরে কেউ যদি সেই অবস্থাতেই তওয়াফ-আদি সেরে বাড়ি ফিরে প্রকাশ করে তাহলে তার স্বামী বা অভিভাবকের উচিত, তাকে পুনরায় মক্কায় নিয়ে এসে তওয়াফ (এবং সাঈ জরুরী থাকলে সাঈ) করানো। এর মধ্যে যদি সে সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে তাহলে ৩টি রোযা রাখবে অথবা ৬টি মিসকীনকে (সওয়া ১কিলো করে চাল) খাদ্য দান করবে অথবা ১টি ছাগল বা ভেঁড়া কুরবানী দিতে হবে। স্বামী-সহবাস করে থাকলে মক্কায় ১টি কুরবানী দিয়ে তার গোশ্ত্ হারামের ফকীরদের মাঝে বিতরণ করবে। আর এমন মহিলাকে উক্ত কাজের জন্য অবশ্যই তওবা করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৩৮)*

তওয়াফের পর সাঈ করার পূর্বে মাসিক শুরু হলে সাঈ সেরে নেবে। কারণ, সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত ও জরুরী নয় এবং সাঈর স্থানও মসজিদের মধ্যে গণ্য নয়। তাই সে সেখানে অবস্থান ও অপেক্ষাও করতে পারে। *(ঐ ২/২৩৯)*

এ সব ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্য মহিলা মাসিক আসার সময় বুঝে মাসিক বন্ধ রাখার ট্যাবলেট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। *(ঐ ২/১৮৫)*

ইফরাদের নিয়ত হলে তওয়াফে কুদূম না করতে পারলেও কোন ক্ষতি নেই। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৫১)* কেবল হজ্জের তওয়াফই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে সে সরাসরি মিনায় যেতে পারে।

তওয়াফ করতে করতে ওযু নষ্ট হলে তওয়াফ ছেড়ে ওযু করে পুনরায় নতুন করে তওয়াফ করবে।

তওয়াফে নারীদেহ স্পর্শ হলে যদি লজ্জাস্থানে কোন তরল পদার্থ অনুভূত না হয়, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য সকলের উচিত, বেগানা নারীর স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করা। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬১৩)*

তওয়াফ ও সাঈর জন্য যদি কেউ কাউকে বহন করে তবে বাহকের জন্যও তা যথেষ্ট হবে। বাহককে আর নতুন করে পৃথকভাবে তওয়াফ ও সাঈ করতে হবে না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৩/৯৫)*

তওয়াফের পর ২ রাকআত নামায সুন্নত। কেউ ভুলে তা না পড়লে কোন ক্ষতি হয় না। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৪০পৃঃ)*

তওয়াফ করাকালে জরুরী কথাবার্তা বলা দূষণীয় নয়।

হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নত। তা চুমতে গিয়ে লড়াই করা বা কাউকে ঘুষ দেওয়া মহাপাপ। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/১৭)*

ভিঁড়ের কারণে দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলায় উঠে তওয়াফ ও সাঈ করা যায়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১/১৯৪)*

কারণবশতঃ তওয়াফের ২/৩ দিন পরও সাঈ করতে পারা যায়। যেহেতু তা তওয়াফের পরপরই করা কোন শর্ত নয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৫২)*

হজ্জের তওয়াফের আগে সাঈ করে নেওয়া যায়। অবশ্য উত্তম হল, তওয়াফের পরই সাঈ করা। তবে উমরার তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা যায় না; করলে তওয়াফের পর পুনরায় সাঈ করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬২২, ৬২৪)*

সাঈর এক চক্কর ছুটে গেলে এবং বহু পরে মনে পড়লে অথবা সুযোগ হলে পুনরায় নতুনভাবে ৭ চক্কর সাঈ করবে। *(ঐ ২/৬২৩)* হালাল হয়ে সফর করে থাকলে মনে পড়া মাত্র পুনরায় ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে নতুনভাবে সাঈ করে চুল কাটবে। *(ঐ ২/৬২৮)*

না জেনে ঠিক তওয়াফের মত সাঈও ৭ চক্কর (অর্থাৎ ১৪ বার যাতায়ত) করে থাকলেও ৭ বারই গণ্য হবে এবং অজান্তে বাড়তি করায় কোন ক্ষতি হবে না। *(ঐ ২/৬২৬)*

সাফার পরিবর্তে মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করলে সাঈ হবে না। পুনরায় সাফা থেকে শুরু করে সাঈ করতে হবে। *(ঐ ২/৬২৮)*

যুল হজ্জের ৮ তারীখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়লে এবং মিনায় রাত্রি বাস না করলে কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য তা সুন্নত। মতান্তরে ওয়াজেব। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৭পৃঃ)*

আরাফার ময়দানে হাত তুলে দুআ করা যায়। জামাআতের একজন দুআ ও বাকী

'আমীন-আমীন' করলেও দোষ নেই। তবে একাকী দুআই এখানে শরীয়ত-সম্মত ও উত্তম। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৬৭-২৬৮, আল-মুমতে ৭/৩২৯-৩৩০)*

আরফার সীমা থেকে সূর্যাস্তের পূর্বেই বের হয়ে এলে ফিদ্য়্যাহ লাগবে; যা মক্কায় যবেহ করে সেখানকার গরীবদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। দেশে ফিরে গেলে এবং পুনরায় মক্কায় যাওয়া সম্ভব না হলে মক্কার মুসাফির বা পরিচিত কাউকে এ দায়িত্বভার সমর্পণ করবে। কেউ না থাকলে দেশেই যবেহ করে গোশ্ত গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৬/২৫৪, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৬৪)*

মুযদালিফায় রাত্রিবাস ওয়াজেব। ত্যাগ করলে দম লাগবে। মুযদালিফায় ফজরের নামায পেলে সেটুকুই যথেষ্ট। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭১)* আরাফা থেকে মুযদালিফা আসতে আসতে যদি অর্ধরাত্রি পার হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে মাগরিব-এশার নামায চলার পথে মুযদালিফার বাইরে হলেও পড়ে নেবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭০)*

মাশআরুল হারামে গিয়ে দুআ করা ওয়াজেব নয়; করা ভালো। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭১)*

মুযদালিফার সীমানায় প্রবেশ না করতে পারলে সেখানে রাত্রিবাস মাফ হয়ে যাবে এবং দম লাগবে না। *(ঐ)* এখান থেকে মুআল্লিমের বাস অর্ধরাত্রির পূর্বে তাড়াহুড়া করে চলে যেতে চাইলে বাস ছেড়ে পায়ে হেঁটে ফজরের পর মিনায় যাবে। হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে বাসেই যাবে। বাধ্য হওয়ার কারণেই তার উপর দম ওয়াজেব হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬০০)* এ স্থান হতে অর্ধরাত্রির পর মিনা যাওয়া যায়। তবে চন্দ্র অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। আর এ শুধু দুর্বল শ্রেণীর মানুষ (ও তাদের সহযোগী সঙ্গী)দের জন্য। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭২)* অর্ধরাত্রির পর এই শ্রেণীর মানুষরা জামরায়ে আক্বাবায় পাথর মেরে মক্কায় হজ্জের তওয়াফও করতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৮৬)* তবে অর্ধরাত্রির পূর্বে রম্ই ও তওয়াফ করলে তা শুদ্ধ হবে না। করে ফেললে পুনরায় করতে হবে। নচেৎ রম্ইর জন্য মক্কায় দম দেবে এবং তওয়াফ যুল হজ্জের বা মুহার্রামের শেষে অথবা যখন ভুল বুঝতে পারবে তখনই মক্কা এসে পূর্ণ করবে। নচেৎ হজ্জ হবে না।

তওয়াফে ইফাযাহ সফর করা পর্যন্ত পিছিয়ে রাখা যায়। ভিঁড়ের ভয়ে যুল হজ্জের শেষের দিকেও করা যায়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬২৪)* বরং সঠিক ওযর থাকলে যুল হজ্জ মাসের পরেও করতে পারে। *(ঐ ৬৪০)*

তওয়াফে ইফাযার পূর্বে কেউ মারা গেলে তার তরফ থেকে তওয়াফ পূর্ণ করতে হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬১২)*

তওয়াফ ও সাঈ করতে করতে বৈধ কথা বলা, পানি পান করা, ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু

আরাম নেওয়া বৈধ। *(ঐ ২/৬২০)*

পাথর মেরে কেশ মুন্ডন করার পর তওয়াফে ইফাযাহর পূর্বে স্ত্রী-চুম্বন বা আলিঙ্গনের ফলে বীর্যপাত করলে তওবা সহ দম লাগবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৭৪)*

প্রথম হালালের পূর্বে যদি কেউ স্ত্রী-সহবাস করে ফেলে তবে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য বাকী হজ্জের কাজ তাকে পূরণ করতে হবে এবং কাফ্ফারা স্বরূপ একটি উঁট কুরবানী দিয়ে তার গোশ্ত্ মক্কার মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। আর ঐ বাতিল হজ্জ নফল হলেও তাকে আগামীতে নতুনভাবে পালন করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২১২)*

স্বপ্নদোষে বীর্যপাত ঘটলে হজ্জ বা উমরার কোন ক্ষতি হয় না। *(ঐ ২/২৩৩-২৩৪)*

তওয়াফে ইফাযাহ বা সাঈ কেউ করতে সক্ষম না হলে অন্য কেউ তার নায়েব হয়ে করে দিতে পারে না। খাট বা ঠেলা গাড়িতে বসে অথবা কারো কাঁধে বা পিঠে চড়ে তাকে নিজে করতে হবে। যদি সম্ভব না হয় তবে রোগ বা দুর্বলতা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং ইহরাম খুলবে না। যদি আরোগ্যের আশা না থাকে তবে একটি ছাগল বা ভেঁড়া যবেহ করে তার গোশ্ত্ মক্কার গরীবদের মাঝে বিতরণ করে হালাল হয়ে যাবে এবং হজ্জ আগামীতে কাযা করবে। *(ঐ ২/২৪৩)*

কোন কারণবশতঃ হজ্জের কুরবানী দিতে না পারলে ১০টি রোযা রাখবে। ৩টি হজ্জে, আরাফার দিনের পূর্বে রেখে নেবে এবং বাকী ৭টি দেশে ফিরে রাখবে। আরাফার দিন রোযা রাখবে না। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৩৮-পৃঃ)* হজ্জের মধ্যে ঐ ৩টি রোযা তাশরীকের দিনগুলিতে ১১, ১২, ১৩ তারীখেও রাখতে পারে। আর এটা ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ আইনের ব্যতিক্রম। তবে আরাফার দিনের পূর্বেই রোযা রেখে নেওয়া উত্তম; যদি তার পূর্ব থেকেই জানা থাকে যে, সে কুরবানী দিতে পারবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৯৫-২৯৬)* মক্কাবাসী হাজীদের জন্য ঐ কুরবানী নেই।

১৩ তারীখের সূর্য অস্ত গেলে আর কুরবানী সিদ্ধ হবে না। *(ঐ ২/২৯৬)* অতএব ৩টি রোযা রেখে তাশরীকের দিনসমূহ অতিবাহিত করে পুনরায় কুরবানী দিতে চাইলে আর হবে না। বাকী রোযা দেশে পূর্ণ করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৬০)*

কুরবানী মিনাতেই যবেহ করা জরুরী নয়। মক্কার হারামের সীমার ভিতরে যে কোন স্থানে কুরবানী যবেহ করা যায়। হারামের সীমার বাইরে হজ্জের কুরবানী সিদ্ধ হবে না; যদিও তার গোশ্ত্ হারামের ভিতরে বিতরণ করা হয়।

কুরবানী যবেহ করে সম্পূর্ণ ফেলে দেওয়া বৈধ নয়। বরং তার কিছু খাওয়া ও দান করা কর্তব্য। কুরবানী করতে ভুলে গিয়ে দেশে ফিরলে কুরবানী সত্বর মক্কায় পাঠাতে হবে।

চুল কাটতে ভুলে গিয়ে সফর করার পর স্মরণ হলে, স্মরণ হওয়া মাত্র (পুরুষ হলে এবং ইহরামের কাপড় খুলে ফেললে) ইহরামের কাপড় পরবে এবং হজ্জ পুরা করার নিয়তে চুল কেটে নেবে। অতঃপর যদি এর পূর্বে মক্কায় স্ত্রী-সহবাস করে থাকে তবে মক্কায় ১টি (ছাগল বা ভেঁড়া, নচেৎ উঁট বা গরুর ৭ ভাগের ১ ভাগ) দম লাগবে। আর সে গোশ্ত সেখানকার গরীবদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। তবে যদি সহবাস মক্কার বাইরে কোথাও হয় তবে দেশেই ঐ ফিদ্য়্যাহ যবেহ করে দেশের গরীবদের মাঝে তার গোশ্ত বিতরণ করতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৭)* তদনুরূপ যে ব্যক্তি না জেনে মাথার সম্পূর্ণ চুল না ছেঁটে কেবল এখান-ওখান থেকে কিছু চুল কেটে হালাল হয়েছে সে ব্যক্তির জন্যও বিধান এই। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৩৪)*

তাশরীকের রাত্রিগুলো মিনায় যাপন করা জরুরী। অবশ্য ১২ তারীখের সূর্যাস্তের পূর্বে বের হয়ে গেলে ১৩ তারীখের রাত্রি যাপন করতে হয় না। কিন্তু যদি কেউ ১১ তারীখে মিনা ত্যাগ করে চলে যায় তবে তাকে ফিদ্য়্যাহ দিতে হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৮৮)* অবশ্য অসুখের কারণে ত্যাগ করতে বাধ্য হলে কোন কিছু ওয়াজেব নয়। আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব অর্পণ করেন না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭৬)*

রাত্রির অধিকাংশ সময় মিনায় কাটিয়ে বাকী সময় (অথবা সারা দিন) অন্য কোথাও বা মাসজিদুল হারামে কাটানো যায়। তাতে কোন ক্ষতি হয় না। *(ঐ ২/২৭৪)*

মিনায় থাকার জন্য জায়গা না পেলে মিনার সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় মিনায় অবস্থানকারী অন্যান্য হাজীদের পাশাপাশি স্থান নিয়ে বাস করবে। মিনার সীমানার ভিতরে জায়গা পায়নি বলে মক্কায় রাত্রিযাপন বৈধ হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬০৪)*

যেমন সামর্থ্য থাকতে কম ভাড়া পেয়ে মিনা ছেড়ে মুযদালিফায় খিমা নেওয়া বৈধ নয়।

নিরুপায় হলে রাত্রিতেও পাথর মারা যায়। এক দিনের পাথর পর দিনে মেরে কাযা করা যায়। *(ঐ ২/২৮৪)* অবশ্য আগামী কালের পাথর আজ আগাম মারা যায় না।

পাথর মারতে সক্ষম ব্যক্তি অপরকে প্রতিনিধি করতে পারে না; করে থাকলে দম লাগবে। যাকে প্রতিনিধি করা হবে তাকে বর্তমানে হাজী হতে হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১৪০)* প্রতিনিধি পাথর না মারা পর্যন্ত মিনা ত্যাগ করা যাবে না। সুতরাং ১২ তারীখের সকালে কাউকে পাথর মারতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মিনা ত্যাগ করা বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৪০-২৪২)*

তাশরীকের (১১, ১২, ও ১৩ তারীখের) দিনগুলিতে সূর্য ঢলার আগে পাথর মারা সিদ্ধ ও যথেষ্ট নয়। সূর্য ঢলার পূর্বে পাথর মেরে সফর করে থাকলে মক্কায় ফিদ্য়্যাহ লাগবে।

তদনুরূপ ৭টি পাথরকেই একই সঙ্গে ছুঁড়ে মারলে, ছোট জামরাহ থেকে শুরু না করে বিপরীত দিকে বড় জামরাহ থেকে শুরু করে পাথর মেরে থাকলেও মক্কায় দম লাগবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৮৫, ২৮৬)* অবশ্য সময় থাকতে কাযা করে নিলে দম লাগবে না।

পাথর স্তম্ভে লাগা জরুরী নয়; জরুরী হল হওযে পড়া। হওযে না পড়লে দম লাগবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৩৫-৬৩৬)* রম্‌ই শেষ হওয়ার পূর্বে পাথর শেষ হয়ে গেলে হওয থেকে দূরে কোন জায়গা হতে পাথর কুড়িয়ে এনে বাকী রম্‌ই পূর্ণ করে নেওয়া যাবে। *(ঐ ২৩৬)*

মিনায় রাত্রিবাস ও সমস্ত রম্‌ই ত্যাগ করলে ১টি মাত্র ফিদ্‌য়্যাহ দিলেই যথেষ্ট হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৩/৯৪)* অবশ্য ফিদ্‌য়্যাহ দেওয়ার পর পুনরায় কোন ওয়াজেব ত্যাগ করলে পুনরায় ফিদ্‌য়্যাহ লাগবে।

ঋতুমতী মহিলার জন্য তওয়াফে বিদা' মাফ। দুর্বল ও রোগী হাজীদেরকে বহন করে বিদায়ী তওয়াফ করাতে হবে। ত্যাগ করলে দম লাগবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৬/২৫৪, ১৪/১৩৭)* তওয়াফে বিদা'র পরপরই মক্কা ত্যাগ করতে হবে। বহু দেরী করে ফেললে পুনরায় তওয়াফ করতে হবে। অবশ্য তওয়াফের পর কিছু কেনা-কাটা করায় ও সঙ্গীদের অপেক্ষায় কিছু দেরী হওয়ায় দোষ নেই। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৪৩পৃঃ)*

সফরের দিন মক্কায় গিয়ে বিদায়ী তওয়াফ করে পুনরায় মিনায় এসে কাঁকর মেরে বাড়ি ফিরা বৈধ নয়। *(দলীলুল হাজ্জ দ্রঃ)*

বিদায়ী তওয়াফের পর না জেনে ভুলক্রমে সাঈ করে ফেললে কোন কিছু ওয়াজেব হয় না। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬২৫)*

বিদায়কালে কাবার মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় উল্টা পায়ে বের হয়ে সম্মান প্রদর্শন এবং মসজিদের দরজায় বিশেষ বিদায়ী দুআ পাঠ শরীয়ত-সম্মত নয়।

পুরুষ মহিলার তরফ থেকে এবং মহিলা পুরুষের তরফ থেকে হজ্জে বদল করতে পারে। তবে এর জন্য শর্ত এই যে, তাকে নিজের হজ্জ আগে করে থাকতে হবে। গরীব সামর্থ্যহীন পিতা-মাতার তরফ থেকে হজ্জ করা যায়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৭২-৭৩)*

জীবিত অবস্থায় কেউ একাধিকবার হজ্জ করে মারা গেলেও তার তরফ থেকে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নফল হজ্জ করা যায়। *(ঐ ১৮/১১৮)*

একই সফরে পিতার নামে উমরাহ ও মাতার নামে হজ্জ করা যায়। *(ঐ ১২/৯৭)*

শক্তি ও সামর্থ্য থাকতে কারো দ্বারা হজ্জে বদল করানো শুদ্ধ নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৫০)*

মৃত মা-বাপের তরফ থেকে নায়েব বানিয়ে হজ্জ করানো যায়। *(ঐ ২/৬৫১)*

হজ্জে বদলের জন্য খরচ নিয়ে বেড়ে গেলে যদি দেওয়ার সময় মুওয়াক্কেল বলে যে, 'যা

খরচ হয় করো বা এই অর্থ থেকে খরচ করো' তাহলে বাকী অর্থ ফেরৎ দিতে হবে। অন্যথা যদি অর্থ দেওয়ার সময় বলে যে, 'এ অর্থ তোমাকে আমার নামে হজ্জ করার জন্য দিলাম' তাহলে ফেরৎ না দিলেও দোষ নেই। *(ঐ ২/৬৫২)*

একই সফরে বারবার উমরাহ; একবার মায়ের জন্য, দ্বিতীয়বার বাপের জন্য, তৃতীয়বার দাদীর জন্য এবং এইভাবে আর কারো জন্য (বা নিজের জন্য) তানঈম থেকে আসা-যাওয়া করে আদায় করা বিধিসম্মত নয়। তাছাড়া মৃতের নামে হজ্জ করার চেয়ে দুআ করাই বেশী উত্তম। *(ঐ ২/১৯৮, ২৬৬)*

মৃত বেনামাযীর তরফ থেকে হজ্জ গৃহীত হবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৮৬)*

পিতার পয়সায় হজ্জ করলেও পুত্রের ফরয আদায় হয়ে যায়। *(ঐ ২/১৮৮)*

ফরয হওয়া সত্ত্বেও পিতা হজ্জ না করে মারা গেলে পুত্র বা ওয়ারেসের উচিত, নিজের হজ্জ আদায় করে তার তরফ থেকে হজ্জ করা, অথবা পিতার ছেড়ে যাওয়া অর্থ থেকে কোন হাজীকে খরচ দিয়ে তার তরফ থেকে হজ্জ করার দায়িত্ব দেওয়া। *(ঐ ২/১৯৪)* যেমন ছেলে হজ্জ ফরয রেখে মারা গেলে তার পিতা বা অভিভাবকের উচিত, তার তরফ থেকে ফরয পালন করে দেওয়া। *(ঐ ২/১৯৫)*

প্রকাশ যে, নফল হজ্জ-উমরাহ করতে অর্থ ব্যয় করার চেয়ে ঐ অর্থ জিহাদে ব্যয় করা অধিক উত্তম। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৭৭)*

শিশুকে হজ্জ করালে, শিশু যদি এমন কাজ করে বসে যাতে ফিদ্য়্যাহ ওয়াজেব, তাহলে অভিভাবককে তার তরফ থেকে তা আদায় করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৮২)*

পাপকর্মে অটল থেকে হজ্জ করলে হজ্জ শুদ্ধ, তবে অসম্পূর্ণ। পাপ থেকে তওবা জরুরী। শির্ক করা অবস্থায় হজ্জ করলে তো তা মকবূলই নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১৪০)*

কোন বেনামাযী হাজীর হজ্জ গৃহীত নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৬৮৭)*

হজ্জের নামে উদ্দেশ্য ভিন্ন হলে হজ্জ হয় না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৮)* তবে আসল উদ্দেশ্য হজ্জ হলে এবং তার সাথে কিছু ক্রয়-বিক্রয় ও বৈধ ব্যবসা করলে হজ্জের কোন ক্ষতি হয় না। *(কুঃ ২/১৯৮)*

হজ্জ করার জন্য হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ হওয়া জরুরী। বিড়ি-সিগারেট প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের ব্যবসার অর্থে হজ্জ হয় না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৬/১১৬)*

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

"যা ধনী তুই যা-রে হজে ফরয আদায় কর্ রে,
ধনের মায়া ত্যাগ করে দেখ্ বারেক কা'বা-ঘর রে।"

এক নজরে হজ্জের পদ্ধতি
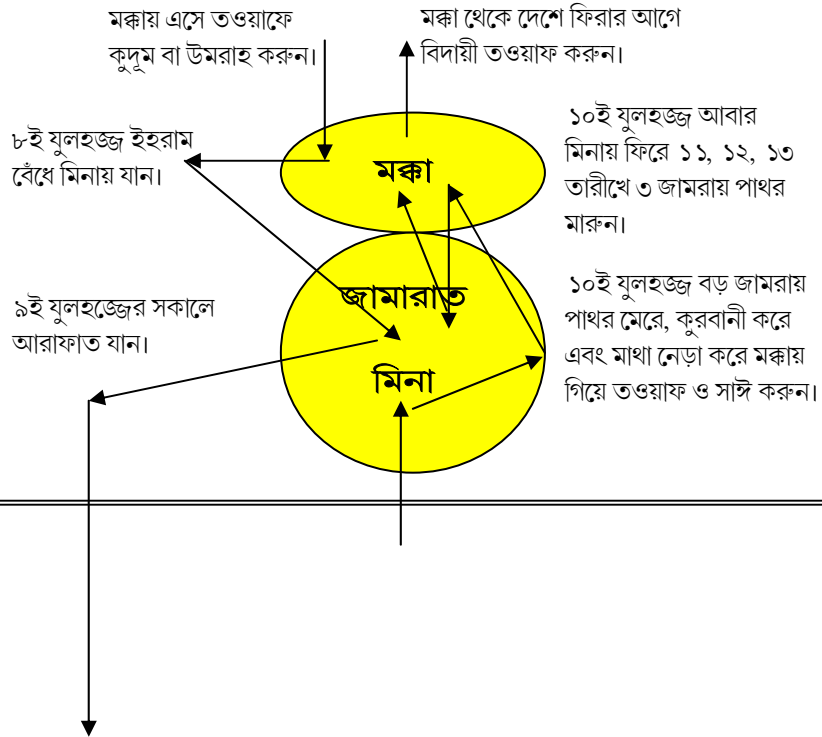
১০ই যুলহজ্জের সকালে মিনায় ফিরে জামারাতে যান।
মুযদালিফা
৯ই যুলহজ্জ সূর্য ডুবার পর মুযদালিফায় যান।
আরাফাত